এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা (১৯৮২-৯০)

আফতাব আহমাদ/
নূরজাহান আফতাব

এম. ফিল ডিগ্রির জন্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা নির্দেশকঃ ডঃ হাসান মোহাম্মদ
অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

429724

উপস্থাপকঃ মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

Dhaka University Library
429724

জানুয়ারি, ২০০০

উৎসর্গ

আমার আব্বা এবং আম্মা

ডাঃ মোঃ আমিন পাটওয়ারী

ও

মিসেস হোসনে আরা বেগমকে

429724

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা (১৯৮২-৯০)' শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি শেষ করতে পারায় মহান রাব্বুল আ'লামিনের অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় গবেষণানির্দেশক প্রফেসর ডঃ হাসান মোহাম্মদের প্রতি যাঁর বিজ্ঞ নির্দেশনা, পরামর্শ ও উৎসাহের ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণাকর্মের কোর্সওয়ার্ক সম্পাদন করার জন্য সর্বজনাব প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, প্রফেসর ডঃ মাখদুম-ই-মূলক মাশরাফী এবং সহকারী অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীর প্রতি বিশেষভাবে ঋণী। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁদের আন্তরিক আগ্রহ ও পরামর্শ আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সাহস যুগিয়েছে যেমন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর ডঃ এম. বদিউল আলম, প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমদ, প্রফেসর ডঃ আব্দুল হাকিম, প্রফেসর আ.ফ.ম জিয়াউন নাহার, প্রফেসর ডঃ মাহফুজুল হক চৌধুরী, প্রফেসর ডঃ এ.এন.এম. মুনির আহমদ এবং প্রফেসর ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরীসহ রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এম.ফিল থিসিস মূল্যায়ন বিষয়ক কাজে কষ্ট স্বীকার করার জন্য সম্মানিত পরীক্ষকদের নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।

429724

গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহ, উৎসাহ এবং সাক্ষাৎকার দিয়ে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনার লাইব্র্যারি (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), দৈনিক সংগ্রাম লাইব্র্যারি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী
জানুয়ারি, ২০০০
চট্টগ্রাম।

429724

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ

উপক্রমণিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ১৭

এরশাদ সরকার ও বিরোধীদলের আন্দোলন

লেঃ জেঃ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ ১৭

এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ১৯

রাজনৈতিক দল গঠন ১৯

গণভোট ২১

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৩

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২৫

বিরোধী দলের আন্দোলন ২৬

বিরোধী দলের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ২৯

চূড়ান্ত আন্দোলন এবং এরশাদের পতন ৩৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৪২

জামায়াতে ইসলামী পরিচিতি ৪২

সামরিক শাসন সম্পর্কে জামায়াতের দৃষ্টি ভঙ্গি ৪৭

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকার ইতিহাস ৪৮

আন্দোলনের সূচনা ৫০

সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবী ৫৭

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কটের আহবান ৫৮

কেয়ার-টেকার সরকার দাবি ৫৮

রাজনৈতিক সংলাপঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে কেয়ার-টেকার সরকারের প্রস্তাব ৬০

সংসদে জামায়াত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৬২

বিরোধী দলের সাথে জামায়াতে যুগপৎ আন্দোলন ৬৭

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বঃ জামায়াতের কর্মসূচী ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের ভূমিকা ৮৩

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিকা ৮৫

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণঃ জামায়াতের লাভ ক্ষতি ৮৬

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী দল ১০০

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১০০

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ১০৮

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ১০৯

ফরায়েজী জামায়াত ১১১

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ১১১

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১১২

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

উপসংহার ১১৭

শব্দকোষ ১৩৩

গ্রন্থপঞ্জী ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা

ইউপিপি - ইউনাইটেড পীপল্স্ পার্টি

ই ছা শি - ইসলামী ছাত্র শিবির

এজিএস - অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সেক্রিট্যারি জেনারেল/ সহকারী সাধারণ সম্পাদক

জাসদ - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

জিএস - জেনারেল সেক্রিট্যারি / সাধারণ সম্পাদক

ডাকসু - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

ন্যাপ - ন্যাশন্যাল্ আওয়ামী পার্টি

বাকশাল - বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

বিএনপি - বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বাসদ - বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল

বি এম এ - বাংলাদেশ মেডিক্যাল্ অ্যাসোশিয়েশন্

ভিপি - ভাইস প্রেসিডেন্ট /সহ সভাপতি

APSU – All Parties Students' Unity

COP – Combined Opposition Parties

DAC – Democratic Action Committee

IIFSO- International Islamic Federation of Students' Organization

NDF – National Democratic Front

PDM- Pakistan Democratic Movement

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকাঃ

১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে প্রায় দু'শ' বছর এ ভূখন্ডের জনগণ ইংরেজদের অধীনস্থ থাকতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম এবং অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পর ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান ইসলামের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে যায়। পাকিস্তান কায়েম হবার পর স্বাধীন মুসলিম দেশটিতে ইসলামী শরীয়াহ্ তথা ইসলামী আইন-কানুন চালু করা হয়নি। জনগণের সাথে প্রতারণা এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তানী নেতৃত্বের সংঘাত জনগণকে হতাশ করে। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জনপ্রিয়তা হারান। সেনাপতি আইয়ুব খান সে সুযোগে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন।

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রতারণা, বঞ্চনা, নির্যাতন আর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধেও এ ভুখন্ডের জনগণ আন্দোলন, সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পরবর্তীতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আইয়ুবের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় ১০ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খান অগণতান্ত্রিক পন্থায়

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হন এবং সেনাবাহিনীকে নিরীহ জনগণের ওপর লেলিয়ে দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে শুরু হয় পশ্চিমা সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ অভিযান। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সবক'টি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ভূমিকা রাখে। ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে না পেরে তারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শামিল হতে পারেনি।[১] ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহন করে। ধর্মের নামে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতন এবং '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধী ভূমিকার কারনে আওয়ামী লীগ সরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২৪-৭৫) সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের সকল ধারা স্থগিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী পাস করা হয়। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র হতে দেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এক ডিক্রির মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে বাকশাল নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং নিজে এ দলের চেয়ারম্যান হন। একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা তথা বাকশালের কার্যক্রম খুব বেশি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। কারণ, ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক নেতার সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর একটি অংশের হাতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থানের পর মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। প্রায় ৮০ দিনের মাথায় বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাচ্যুত হন। সুপ্রীম্ কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হন। ৭ নভেম্বর, '৭৫ জিয়াউর রহমান মুক্তি পেয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তিনি ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ৩০শে নভেম্বার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ২০শে এপ্রিল তিনি প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে জিয়া রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সুগম করে দেন। ১৯৭৯ সালের মে মাসে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়ার জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নির্বাচিত সরকার হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে শুরু করে। কিন্তু ২ বছরের বেশি জিয়া দেশ পরিচালনা করার সুযোগ পাননি। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে কিছু সেনা অফিসারের হাতে তিনি নিহত হন। অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে বিচারপতি সাত্তার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু চার মাসের মাথায় তৎকালীন সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ রাষ্ট্রপতি সাত্তার থেকে জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং সর্বময় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে যান। তিনি সংবিধান স্থগিত করে এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সামরিক আইন জারি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির মহান লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২১ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশটি শাসন করেছে।[২] সামরিক শাসনের ১ বছরের মাথায় এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ঘটে। প্রায় দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট (পরবর্তীতে ৮দলীয় জোট), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি.এন.পি) চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এ দুটি জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ অন্যান্য ইসলাম পন্থী দল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেয়। তারা যুগপৎভাবে মিছিল মিটিং, সমাবেশ, বিক্ষোভ, হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এরশাদ সরকার বিরোধী এ আন্দোলনে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কতটুকু কার্যকর ছিল তা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এবং গবেষণার দাবি রাখে। আমার জানামতে, এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই বিভিন্ন সূত্র এবং উপাত্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় সকল দলই ইসলামের নামে কমবেশি রাজনীতি করেছে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামকে সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করে। ইসলাম রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক কোন বিষয় মনে করেনা। "ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব এ ধারনার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

ও সরকার ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা শরীয়াহ্‌র ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে। তাই রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথবা নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা বিষয় নয়" ।[৩]

ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারনে প্রায় সকল ইসলামী দল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করে। তাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান বিভক্তি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফসল। ইসলামপন্থী দলগুলো পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ছিল। উপরন্তু সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী সংগঠনগুলোর পক্ষে আপস করা সম্ভব হয়নি। জামায়াত ও অন্যান্য সংগঠন স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি বরং তারা বিরোধিতা করেছে আধিপত্যবাদের এবং সমাজতন্ত্রের নামে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার। বাংলাদেশ হবার পর জামায়াত ও ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী অন্যান্য দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু মেনেই নেয়নি অধিকন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।[৪]

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামপন্থী দলগুলোর অধিকাংশ পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাথে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি অংশ গ্রহণ করে । ১৯৬৪ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় সম্মিলিত বিরোধী জোট (COP) গঠিত হলে জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম সে জোটে সক্রিয় দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৬ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে "পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন" (PDM) নামক জোট গঠন করে। এ জোটে অন্যান্য সদস্য ছিল ৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, এন.ডি.এফ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ এ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পি.ডি.এম এ যোগ দেয়। তখন এ জোটের নামকরণ করা হয় ডাক (DAC)। এ সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। আন্দোলনের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের কারণে ১৯৬৪ সালে অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল জামায়াত ইসলামী পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর প্রধান সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।[৫] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বারবার জোর দাবি জানানো হয়।[৬] পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার দাবি জানান।[৭] এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনেও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষতঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১. এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর কর্মসূচী পর্যালোচনা।
২. এ আন্দোলনে দলগুলোর ভূমিকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ণ।
৩. আন্দোলনের দ্বারা দলগুলোর সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক অর্জন বিশ্লেষণ।

তাত্ত্বিক কাঠামোঃ

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি অধ্যায়নে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৭৯টি দেশে ৩১১ বার সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর মধ্যে ১৭০টি সফল হয়।[৮] ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ৩৫টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতার অর্ধেক বা তারও বেশি সময় সামরিক শাসনের অধীন ছিল। একই সময়ে ২৬টি উন্নয়নশীল

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীনতার অর্ধেকের চেয়ে কম সময় সামরিক শাসনাধীন ছিল।[৯] অবিভক্ত পাকিস্তানে কোন রক্তপাত ছাড়াই ১৯৫৮ এবং ১৯৭০ সালে দু'পর্যায়ে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হবার পরও দেশ দু'টি দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামরিক শাসনের অধীনে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথমে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে দেশ শাসন করতে শুরু করেন। বাংলাদেশে সামরিক শাসন কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয় বরং স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তানী সামরিক শাসনেরই অনেকটা উত্তরাধিকার।

লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতার একচছত্র নিয়ন্ত্রক ছিলেন। বাংলাদেশের এ অধ্যায়কে আমরা এরশাদ সরকারের শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করছি। এ সময়ের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকারের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছি। রাজনৈতিক কর্মসূচী বলতে এরশাদ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর বিবৃতি-বক্তৃতা, মিছিল-সমাবেশ, জনসভা, হরতাল-অবরোধ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এরশাদকে স্বৈরশাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর শাসনকালকে স্বৈরশাসন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কোন দেশের সরকার যখন এক ব্যক্তির একচেটিয়া ক্ষমতার অধীনে পরিচালিত হয় তখন সে দেশের শাসনকে বলা হয় স্বৈরশাসন। স্বৈরশাসক হচেছ সে শাসক যে একচছত্র ক্ষমতার অধিকারী। যে সব সময় মান্য হওয়ার প্রত্যাশা করে কিন্তু অপরের মতামত, অনুভূতি ইত্যাদির প্রতি কোন মনোযোগ দেয়না।[১০] এরশাদের পূর্বে মুজিব এবং জিয়ার শাসনকালেও স্বৈরশাসনের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একটি কার্যকর এবং সার্বভৌম সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে সংসদ এবং মন্ত্রিসভা ছিল মুজিবের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। এ জন্যই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যখন সংসদের সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করা হয় তখন খুব কমসংখ্যক সাংসদ সে সংশোধনীর বিরোধিতা করার সাহস পেয়েছিলেন"।[১১] রাষ্ট্রপতির অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা মুজিব এবং এরশাদের মত জিয়াও ভোগ করেছেন। জিয়ার সময়ও সংসদ সার্বভৌম ছিলনা। নির্বাহী সকল ক্ষমতা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাঁর সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বা এ দু'য়ের সমন্বয়ে কোনটিই ছিলনা। বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে অন্যান্য দেশের একনায়ক শাসকগণের ন্যায় জিয়ার শাসন ছিল একটি একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা।[১২]

রাজনৈতিক দল আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা জানি, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সে ব্যবস্থাকে সচল রাখে। রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী যারা তাদের পারস্পরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধারণ আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। রাষ্টবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, রাজনৈতিক দল বলতে সেইরূপ জনসমষ্ঠিকে বোঝায় যারা নির্দিষ্ট এক কর্মনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে প্রয়াসী হয়। নির্বাচনে জয়ী হওয়া, সরকার পরিচালনা এবং সরকারি নীতি নির্ধারণ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়।[১৩] যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, জনমত গঠন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট গণদাবি পেশ, নাগরিকদের চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য হ্রাসের মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যরত একটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল সাধারণত সম্পন্ন করে থাকে।[১৪] আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা, গোষ্ঠীসমূহকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তাদের আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্বও রাজনৈতিক দলকে পালন করতে হয়।[১৫]

ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদানের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। "ইসলাম" শব্দটিকে এখন ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করেন ঃ ধর্ম বোঝাতে, রাষ্ট্র বোঝাতে এবং একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি বা সভ্যতা বোঝাতে।"[১৬] "যখন ধর্মীয় অর্থে ইসলাম শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয় তখন বোঝান হয় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণকে। যখন রাজনৈতিক অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন বোঝান হয় এমন রাষ্ট্র যার আইনের ভিত্তি হল ইসলাম।"[১৭] ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক এবং বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। এটা মানবজাতির জন্য নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশিকা। পার্থিব জীবনের মানুষের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১৮] ইসলাম তথা ইসলামী শরীয়াহ্ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ শরীয়াহ্ যেমনি পূর্ণাঙ্গ, তেমনি শাশ্বত। "আজকের এ দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত করে দিলাম। আমার যে নেয়ামত তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছিল তা আজ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আমি মনোনীত করলাম।"[১৯] ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি এবং ধর্ম পৃথক কোন বিষয় নয়। ইসলামের উত্থান এর ধর্ম এবং রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারনেই।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে গড়ে ওঠেছে এক বহু বিস্তীর্ণ আইন বিজ্ঞান (Jurisprudence) বা ফিকাহ। সমাজ কাঠামো তথা মানুষে মানুষে সম্পর্কে এমন কোন দিক নেই যা এই আইন বিজ্ঞানের এলাকায় আসেনি। ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একজন অমুসলিম পণ্ডিত বলেছেন, "ইসলামে সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন সম্পর্কে যতটা উৎসাহ গোড়া থেকেই দেখান হয়েছে, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ঠিক ততটা দেখান হয়নি"।[২১]

ইসলামী দলগুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইসলামী আদর্শের প্রচার, জনগণকে সংগঠিত করা, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ইসলামী দলগুলোর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল হচ্ছে সেগুলো যারা ইসলামকে দলের নামে এবং দলীয় আদর্শে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে।[২২] ইসলামী দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলের নেতাদের ইসলামের জ্ঞান থাকা, সে জ্ঞান অনুযায়ী আ'মল বা কাজ করা, ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব আমানতদারীর সাথে পালন করা, কর্মী বাহিনীর মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালানো ইত্যাদি।[২৩] উপরোক্ত আলোচনা এবং সংজ্ঞার আলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বেশ কিছু ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল থাকলেও বর্তমান গবেষণায় শুধু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রধান প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকেই আলোচনায় স্থান দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ উল্লেখযোগ্য। এরশাদের পতনের পর কেয়ার-টেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে মূলতঃ তাদের ওপরই জোর দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। ১৯৮৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের এক রিপোর্টে বাংলাদেশে ৫০টি সক্রিয় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। আদর্শিক পরিচিতি এবং কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটামুটিভাবে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী, সমাজতন্ত্রী, উদারপন্থী প্রভৃতি। বাংলাদেশের একজন রাজনীতিকের মতে, বাংলাদেশী রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাজতন্ত্রী, বাংলাদেশপন্থী এবং আমেরিকাপন্থী হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়।[২৪] রাজনীতি বিজ্ঞানের একজন গবেষক ১৯৯১ সালের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর আলোকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক এবং কর্মসূচীগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। নিম্নের সারণীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫]

দলের নাম	আদর্শ ও কর্মসূচী
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ইসলামী নীতিমালা পাশ্চাত্য মনস্ক বাজার অর্থনীতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ভারতের সাথে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক মিশ্র অর্থনীতি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার মুজিব হত্যাকারীদের বিচার দাবি
জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ইসলামী নীতিমালা পাশ্চাত্য মনস্ক রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয়

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' নীতির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী জাতীয়তাবাদ ভারত বিরোধী মনোভাব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইসলামের আলোকে জীবন ও সমাজ গঠন
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট (সি.পি.বি)	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সোভিয়েত মনস্ক সমাজতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

ওপরের সারণি থেকে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয় পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কর্মসূচী এবং আদর্শগত বেশ কিছু সামঞ্জস্য রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী জীবন ও সমাজকে ইসলামীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। আদর্শগত ও কর্মসূচীগত দিকে থেকে জামায়াতে ইসলামী অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ভিন্ন। বি.এন.পি এবং আওয়ামী লীগ দু'টো দলই 'জাতীয়তাবাদী' আদর্শে বিশ্বাসী হলেও বি.এন.পি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী। আদর্শ এবং কর্মসূচীগত অমিল থাকলেও জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এ গবেষণা কার্যে প্রধানত: ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মূল উপাদান থেকে সরাসরি প্রাপ্ত উপাত্ত (Primary sources) ও অপ্রধান উপাত্ত (Secondary source) ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমোক্ত উপাত্ত সূত্রগুলো হচ্ছে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো, কার্যবিবরণী,

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারপত্র, নির্বাচনী ইশতেহার, পুস্তিকা, বক্তৃতার-বিবৃতি, সম্মেলন-প্রস্তাব ইত্যাদি। এছাড়া নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারও ব্যবহার করা হয়েছে প্রাথমিক তথ্য সূত্র হিসেবে ।

এ গবেষণাকাজে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উপাত্ত সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, প্রতিবেদন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের রচিত বই-পুস্তক, ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত বই-পুস্তক ইত্যাদি। উপর্যুক্ত তথ্যসূত্রসমূহ থেকে সংগৃহিত উপাত্ত যাচাই বাছাই, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ ইত্যাদির মাধ্যমে মোটামুটি নিরপেক্ষভাবে গবেষণা কর্মটি সম্পনের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থী দলগুলোর ভূমিকার ওপর ইতোপূর্বে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত না হওয়ায় উক্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য বা প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নেয়া সম্ভব হয়নি।

২। আন্দোলনে দু'প্রধান জোটের পাশাপাশি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মূলতঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য ইসলামপন্থী দল কিছু সমাবেশ ও মিছিল এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে তাদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। তাই সব ইসলামী দলকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যান্য দল খুব একটা সুসংগঠিত নয়। তাই ওগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের রিপোর্ট বা তদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্র সঠিক ভাবে সংরক্ষিত নেই। জামায়াত ব্যতীত অন্যান্য দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবেদন তৈরী করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দলগুলোর আন্দোলন সংক্রান্ত সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৪। সাক্ষাৎকার প্রদানে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব এবং তাদের সময়াভাবও গবেষণা কর্মের সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

তথ্য সংকেত ঃ

১। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫৮।

২। ডঃ গোলাম হোসেন, 'বাংলাদেশে বিকাশমান গণতন্ত্রঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ', ডঃ হাসান মোহাম্মদ সম্পাদিত *বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, ১৯৯৩, পৃঃ -৭৬।

৩। Jaseph Schachat and C.E Bosworth eds, *The legacy of Islam*, Oxford, (oxford University Press, 1989) p-404

৪। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন*, ১৯৯৩, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

৫। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, *জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর*, ১৯৯২, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। পৃঃ-৪৩

৬। গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১১

৭। গোলাম আযম, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ১৬

৮। Ferguson, G. *Coup De-etat: A practical Manual* (Dorsel: Arms & Armour press Ltd.1987) p.II.

৯। Talukder Maniruzzaman, *Military withdrawal from Politics: A Comparative Study*, Massachusetts, Ballinger Publishing Co. 1987, P-18

১০। A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 5th Edition

১১। মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, আলোচনা, বাংলাদেশ *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা* ১৯৯৩, পৃঃ-৪১

১২। বিস্তারিত দেখুন, Mahbubur Rahman, " Socio-economic Development under Military Regime: Recent Experience in Bangladesh", *The Journal of Political Science*, Dhaka University, Vol-II, 1985, P-54

১৩। R. M. Maciver, *The Web of Government*, New York : The Free Press, 1965,

১৪ । J. Lapalambara and Myron Weiner, " The origin and development of political parties" in their eds, *Political Parties and politiacal development* (New Jersey, Princeton University Press, 1967, P- 3, উদ্ধৃত: ডঃ হাসান মোহাম্মদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ, পৃঃ-৪

১৫ । Rafiqul Islam Chowdhury, Recruitment of Political Elite and Political Development in India & Nigeria, *Ph.D. Dissertation* (Oregon, University of Oregon, 1964) উদ্ধৃত: ডঃ হাসান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত

১৬ । Philip K. Hitti, Islam and the West, Van Nostrand Company Inc. Princeton 1962; p-8 উদ্ধৃতঃ ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (Philip K. Hitti, Islam and the West. (Van Nostrand Company Inc. Princeton 1962) p-8

১৭ । ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত* .

১৮ । Gholam Sarwar, *Islam Belief & Teachings*, The Muslim Education Trust, London, p-13.

১৯ । *আল কুরআন, সূরা মায়েদা*-৩, উদ্ধৃতঃ শহীদ আবদুল কাদের আত্তদাহ, দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, (অনুবাদ মুহাম্মদ আবদুর রহীম) IIFSO, ১৯৭৮ পৃঃ-১৭-১৮

২০ । Robin Wright, The Islamic Resurgence: A new phase, উদ্ধৃত: আবুল আসাদ, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম*, পৃঃ-১৬.

২১ । H.A.R Gibb, *Mohammadanism* (The New American Library, New York, 1955, P- 72) উদ্ধৃত: ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩০

২২ । অধ্যাপক গোলাম আযম, বাংলাদেশের রাজনীতি পৃঃ-৫৫,

২৩ । পূর্বোক্ত - পৃষ্ঠা- ৩৫

২৪ । পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬

২৫ । Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum* University Press Ltd, Dhaka, 1993, P-50-51

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

এরশাদ সরকার ও বিরোধীদলের আন্দোলন

লেঃ জেঃ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশও স্বাধীনতার পর একাধিকবার সামরিক শাসনের কবলে পতিত হয়। স্বাধীনতার ২২ বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় এ দেশটি পরিচালিত হয়েছে সামরিক শাসনে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট সেনাবাহিনীর মধ্যম সারির কিছু অফিসারের হাতে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সদস্যের হাতে তিনিও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রদত্ত ভোটের ৬৫.৫% পেয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর একটি গুঞ্জন ওঠেছিল যে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালের ২৮শে নভেম্বার জেনারেল এরশাদ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন, ক্ষমতা গ্রহণে তাঁর ব্যক্তিগত কোন উচ্চাভিলাষ নেই এবং তিনি সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চান। কিন্তু অন্তরালে বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে সেনাবাহিনীর কার্যকর ভূমিকার ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তার জন্য জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তার সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

ওপর বিভিন্ন সময়ে চাপ প্রদান করেন।[১] তিনি বলেন এর মাধ্যমে গভীর রাজনৈতিক-সামরিক সমাধান হবে এবং এক অথবা দশ বছরেও এমনকি ভবিষ্যতে কখনও ক্যু এবং হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে না।[২] প্রায় সকল রাজনৈতিক দল জেনারেল এরশাদের এ সকল বিবৃতির তীব্র নিন্দা করলেও ঐক্যবদ্ধ কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।[৩] বিচারপতি আবদুস সাত্তার এরশাদের এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবকে বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একেবারে অবহেলা করতে পারেননি এবং তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (National Security Council) গঠনের জন্য মতামত প্রদান করে তাঁর দাবি কিছুটা হলেও মেনে নেন।[৪] কিন্তু তাতেও বিচারপতি সাত্তার রক্ষা পাননি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চার মাসের মাথায় ১৯৮২সালের ২৪শে মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তার থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা কেড়ে নেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ সংবিধান স্থগিত করেন, সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন। জাতির এই সংকটকালে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ ছাড়া বিকল্প ছিলনা বলে তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।[৫] ক্ষমতা গ্রহণের সময় এরশাদ বলেছিলেন তাঁর কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। এমনকি ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় এক বছর পরও ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ তাঁর যোগাযোগমন্ত্রী রীয়্যার অ্যাড্মিরাল মাহবুব আলী খান এরশাদের পক্ষ থেকে পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, সরকারের কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই।[৬] এরশাদ দু'বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৭] কিন্তু তিনি দু'বছরের পরিবর্তে প্রায় নয় বছর (১৯৮২-৯০) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ঃ

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরে তাঁর ক্ষমতা বৈধ বা বেসামরিকীকরণ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে ১৮ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, রাজনৈতিক দলগঠন, গণভোট, সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংবিধান সংশোধন অন্যতম।[৮]

রাজনৈতিক দল গঠন ঃ

এরশাদ যদিও সামরিক বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন নিজের পক্ষে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তারপরও বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে মোকাবেলার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। এরশাদ এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ববর্তী সামরিক শাসক জিয়াকে অনুসরণ করেন। জিয়াও ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুর করেন এবং এ ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। এরশাদের এ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে সংঘঠিত হয়।[৯] এ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এরশাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী, তদানীন্তন দেশের প্রধান নির্বাহী, ১৯৮৩ সালের নভেম্বার মাসে 'জনদল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আওয়ামী লীগ (মিজান) ও বিএনপি নেতা শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপি'র একটি অংশ এ দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরে জাতীয় লীগ, ডেমক্র্যাটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম) ন্যাপ (নাসের ভাসানী) এবং বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের (হাসিনা) একটি ক্ষুদ্র অংশ যোগ দিয়ে জনদলকে শক্তিশালী করে। এরশাদ তাঁর মন্ত্রিসভায় জনদলের কয়েকজন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এরশাদের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের মধ্য অগাস্টে জনদল এবং বিভিন্ন ডান-বাম দল নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়। জনদল ছাড়া এ ফ্রন্টে অন্যান্য শরিক দল ছিল মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), শাহ

Dhaka University Institutional Repository

আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি'র একটি অংশ, কাজী জাফরের ইউনাইটিড পীপল্‌স্ পার্টি (ইউ পি পি) এবং গণতান্ত্রিক দল। এ ফ্রন্ট বেশি দিন কার্যকর ছিলনা। এরশাদ তাঁর রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে এ ফ্রন্ট গঠন করেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে এ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটান। জাতীয় পার্টিতে মূলত: বিভিন্ন ছোট ছোট দল এবং দলছুট নেতাদের সম্মিলন ঘটেছিল। নীতি-আদর্শবিহীন দলছুট নেতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানসিকতাই বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসকদের দল গঠনে সহযোগিতা এবং উৎসাহিত করেছে।

জাতীয় পার্টি এরশাদের সামরিক শাসনের পক্ষে বেসামরিক সমর্থনের প্ল্যাট্‌ফরম্ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে। জাতীয় পাটি মূলতঃ এরশাদের স্বৈরশাসনকে সমর্থন করার জন্য একটি রাজনৈতিক প্ল্যাট্‌ফরম্ ছিল। দলের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুও ছিলেন এরশাদ। তিনি দলের সভাপতি এবং সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সকল ক্ষমতা ভোগ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলের ভূমিকা ছিল গৌণ। এ প্রসংগে একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, "এরশাদের রাজত্বকালে তাঁর ক্ষমতাসীন দল বি টিম হিসেবে কাজ করেছে। মূলতঃ ক্যান্টনমেন্টই ছিল ক্ষমতার মূল উৎস।"[১০] জাতীয় পাটি মূলতঃ বিভিন্ন দলের দলছুট নেতাদের একটি ক্লাব ছিল। এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজনৈতিক পটভূমি খুঁজে দেখলে এর সত্যতার প্রমাণ মেলে। ১৯৮৮ সালের মে পর্যন্ত এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি খতিয়ান নিম্নের সারণি থেকে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের পূর্ব রাজনৈতিক পরিচয় [১১]

(১৯৮৮ সালের মে পর্যন্ত)

পূর্বের রাজনৈতিক দলের নাম	মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৫
আওয়ামী লীগ (বাকশালসহ)	১০
মুসলিম লীগ	০৮
ন্যাপ (ভাসানী), ইউ.পি.পি, গণতান্ত্রিক পার্টি	০৯
জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল)	০২
জাতীয় লীগ	০১
মোট	৪৫

গণভোট:

বিরোধীদলের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সামরিক আইন এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন একসাথে চলতে পারে না এ যুক্তিতে বিরোধীদল এরশাদের ঘোষণা প্রত্যাখান করে।

বিরোধীদলের প্রত্যাখানের ঘোষণায় এরশাদ ক্ষুব্ধ হন এবং শিথিল সামরিক আইনকে আরো কঠোর করার ঘোষণা দেন। রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ঘোষণা করেন, বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দকে গৃহবন্দী করেন বা তাঁদের তৎপরতা কড়া নজরে রাখেন। এরশাদ সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার যুক্তি হিসেবে রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন সৃষ্ট নাগরিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখানের ঘোষণায় জেনারেল এরশাদ প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ২১শে মার্চ ৮৫ সালে গণভোটের তারিখ ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে এরশাদ তাঁর ১৮দফা কর্মসূচীর পক্ষে জনগণের মতামত গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দেন। পল্লী উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ভূমি সংস্কার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন, বেকার সমস্যা সমাধান, সকলের জন্য চিকিৎসা সেবা, দুর্নীতি উচ্ছেদ, জন্মহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ১৮ দফা কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিক। এরশাদের পূর্বে জিয়াউর রহমানও ক্ষমতা দখলের পর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ১৯দফা কর্মসূচী ঘোষণা এবং গণভোট অনুষ্ঠান করেন। এরশাদ এবং জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অনেকটা মিল থাকলেও এরশাদ তাঁর পূর্ণ শাসনকালে 'বৈধতার সংকট' কাটানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। অপরদিকে জিয়াউর রহমান সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতায় আসার পর ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা, রাজনৈতিক দল গঠন, গণভোট অনুষ্ঠান, সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সবকয়টি অংশ গ্রহণ করে। সকল দল এবং জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বৈধতার সংকট কাটিয়ে ওঠতে সক্ষম হন। কিন্তু এরশাদ তাঁর শাসন আমলের কোন পর্যায়ে কোন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেননি। যার পরিণামে পুরো সময়ই এরশাদ বৈধতার সংকটে নিমজ্জিত ছিলেন।

বিরোধীদল ও জোটসমূহ গণভোট প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়। নির্ধারিত তারিখে গণভোট সম্পন্ন হয়। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল গণভোটে ৭২.১৪% ভোটার ভোট দিয়েছে এবং প্রদত্ত ভোটের ৯৪.১৪% রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য এরশাদের

পক্ষে পড়েছে। অবশ্য নিরপেক্ষ এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, ১৫% থেকে ২০% এর বেশি ভোটার ভোটে অংশ গ্রহণ করেনি।[১২] এরশাদ সমর্থকগণ গণভোটকে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে অভিহিত করার চেষ্টা করেন। অবশ্য বিরোধী দল একে ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদ গণভোটকে মানুষের সত্যিকারের মতামত হিসেবে অভিহিত করেন এবং গণভোটে অংশ গ্রহণ করে তাঁর পক্ষে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি ১৯৮৫ সালের ২৬শে মার্চ ১৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেডিও টেলিভিশন প্রচারিত ভাষণে দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঃ

গণভোট সম্পন্ন করার পর এরশাদ তাঁর সরকারকে বেসামরিকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংসদ নির্বাচনের চিন্তা করেন এবং ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ নেয়াবার লক্ষ্যে এ সময় এরশাদ কিছু বিষয়ে ছাড় প্রদান করেন। যেমন: যে সকল মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন নির্বাচনের পূর্বেই তাঁদের পদত্যাগ, নির্বাচনী প্রচারনায় জাতীয় সম্পদের ব্যবহার নিষিদ্ধ, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের অফিস এবং কোর্ট প্রত্যাহার।[১৩] প্রথমতঃ বিরোধী দল এরশাদের এ সকল ছাড় এবং ঘোষণাকে প্রত্যাখান করলেও মনোনয়নপত্র জমা দানের শেষ দিনের ১ দিন পূর্বে মার্চের ২১ তারিখ আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি শরিকদল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করে। সরকার তাদের অংশ গ্রহণের সুবিধার্থে নির্বাচনের সময়সূচী পরিবর্তন করে ৭ই মে পুনঃ নির্ধারণ করেন।

আওয়ামী লীগ বিরোধী সমালোচকগণ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ গ্রহণের কড়া সমালোচনা করেছেন এবং একে এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে আসন ভাগাভাগির চুক্তির ফল হিসেবে বর্ণনা করেন। আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাকশাল, মুসলিম লীগ, জাসদ (রব-সিরাজ) ওয়ার্কার্স পার্টিসহ মোট ২৮টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন মারাত্মক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হয়।[১৪] আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ভোট ডাকাতি এবং মিডিয়া ক্যুর জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করেন।[১৫] তিন সদস্য বিশিষ্ট বৃটিশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ টীম এ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য ট্রাজেডি হিসেবে অভিহিত করেন।[১৬]

১৯৮৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলঃ[১৭]

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্তভোটের সংখ্যা % (প্রদত্ত মোট ভোটের ভিত্তিতে)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৪২.৩৪%
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	২৬.১৬%
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	৪.৬১
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ বাংলাদেশ	৫	০.৯১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪	২.৫৪

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৩	০.৬৭
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	০.৫৩
ন্যাশন্যাল্ আওয়ামী পার্টি	২	০.৭১
অন্যান্য দল	-	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১৬.১৯

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনঃ

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকে থেমে পড়া সরকার বিরোধী আন্দোলন আবার নতুন গতি লাভ করে। ১০ নভেম্বার '৮৬ সালে এক দিনের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আহবান করে অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণসহ এরশাদ সরকারের সকল কার্যক্রম, অধ্যাদেশ, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ বৈধ করার লক্ষ্যে ৭ম সংশোধনী পাস করা হয়। সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বিলকে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ইতিহাসের এক 'কালো অধ্যায়' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৮] সংসদের ৭ম সংশোধনী বিল পাস হওয়ার দিনই সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং স্থগিত সংবিধান পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮৬ সালের অগাস্ট্ মাসে এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। এরশাদ সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় গণভোটের মাধ্যমে তাঁর বৈধতার সংকট কাটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর ন্যূনতম কিছুটা বৈধতা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধান বিরোধী দলগুলোর কোনোটিই নির্বাচনে

অংশ গ্রহণ করেনি। প্রধান বিরোধীদলগুলো বিশেষ করে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কট এবং প্রতিহতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচন বিরোধী কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিরোধীদলগুলো নির্বাচনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ হরতালের ডাক দেয়।

নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে ৫৪.২৩% ভোটার নির্বাচনে ভোট প্রদান করে এবং প্রদত্ত ভোটের ৮৩.৫৭% এরশাদ পান। বিরোধী দল এ নির্বাচনকে প্রহসন হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ৩% এর কম সংখ্যক ভোটার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫%।[১৯] এরশাদ নিজের এবং তাঁর সরকারের রাজনৈতিক বৈধতার জন্য সংসদ এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে বৈধতা অর্জনে তিনি ব্যর্থ হন।

বিরোধী দলের আন্দোলন ঃ

অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ বিভিন্নভাবে তাঁর সরকারকে বৈধতার সংকট থেকে মুক্তি দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ সংকট নিরসন করতে পারেননি। বরং বৈধতার সংকট নিরসন করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় সাধন করেছিলেন। এরশাদের সময় নির্বাচন একটি হাসি-তামাসার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, গণভোট সহ সকল পর্যায়ের নির্বাচনে সন্ত্রাস, ব্যালট ছিনতাই, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এরশাদ তাঁর ক্ষমতার উৎস সামরিক বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মন্ত্রিপরিষদসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিক আমলাদের নিয়োগ দান করেন। ১৯৮৮ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট এরশাদের ক্যাবিনেটে সামরিক আমলা ছিল ১৩জন, বেসামরিক

Dhaka University Institutional Repository

আমলা ৯জন, বুদ্ধিজীবী (শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী) ৭জন এবং ব্যবসায়ী ৬জন।[২০] শুধু মন্ত্রিসভায় নয় বরং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী পর্ষদ যেমন, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, পরিকল্পনা কমিশন প্রভৃতিতে বেসামরিক, সামরিক আমলাগণই ছিলেন প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি। এরশাদ সামরিক বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। এসবের মধ্যে ছিল মূল বেতনের ২০% সার্ভিস ভাতা, বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থান এবং সদাচরণ, দক্ষতা ও ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা ইত্যাদির জন্য আকর্ষণীয় ভাতার ব্যবস্থা।[২১] তাছাড়া এরশাদ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ঐক্যের প্রতীক সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হতে অনুপ্রাণিত করেন। এরশাদ তাঁর বক্তব্য ও বিবৃতির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন,

"Our military is an efficient, well-disciplined and most honest body of truly dedicated and organized national force, potentials of such an excellent force in a poor country like ours can be effectively utilized for productive and nation-building purpose in addition to its role of national defence. This concept requires us to depart from the conventional Western ideas of the role of the armed forces. It calls for combining the roles of nation-building and national defence into one concept of total national defence.[22]

রাষ্ট্রপরিচালনায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ব্যাপারে এরশাদের বক্তব্য, বিবৃতি সেনাবাহিনীর সদস্যদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হতে অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ একদিকে জনগণের মধ্যে এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোটির প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করে। অপরদিকে সেনাবাহিনীর পেশাদারী দক্ষতা এবং সাংগঠনিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকে বিরোধীদলের আন্দোলন জনগণের সমর্থন অর্জন এবং বিশ্বাস জন্মাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী অনেক কেন্দ্রীয় এবং প্রভাবশালী নেতা দিনের বেলায় সরকার বিরোধী আন্দোলনে মাঠ গরম করতেন আর রাতের বেলায় এরশাদ সরকারের সাথে সমঝোতায় উপনীত হতেন। বিরোধী এ সকল নেতার অনেকে সরাসরি এরশাদ সরকারে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এম. কোরবান আলী, বি.এন.পি'র ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরী, আওয়ামী লীগের মিজানুর রহমান চৌধুরী, বি.এন.পি'র শামশুল হুদা চৌধুরী, জাতীয় লীগের এবং সাত দলীয় জোটের অন্যতম নেতা আতাউর রহমান খান, ইউ.পি.পি'র কাজী জাফর আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, বি.এন.পি'র ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ প্রমুখ।

এরশাদের শাসনামলে রাজনৈতিক সংকট দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর এক সুদূরপ্রসারী অশুভ প্রভাব ফেলে। এর ফলে ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, সীমাহীন দুর্নীতি সমগ্র আর্থিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এলীট্ গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়, সম্পদের লুটপাট, একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের বিলাসবহুল জীবন এবং অন্যদিকে বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সীমাহীন দারিদ্র্য ও আর্থিক দৈন্য সরকারের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষের জন্ম দেয়। তাঁর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বের অনুপস্থিতি সৃষ্টি করে বৈধতার সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এর ফলে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং পর্যায়ক্রমে তা মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান স্থগিত, সংসদ বাতিল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডঃ মজিদ খানের শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করে।[২৩] ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্ররা সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মিছিল বের ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ বিডিআর এর সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ এবং গুলিবর্ষণ করে। এদিন অনেক ছাত্র হতাহত হয়। ছাত্রদের বিক্ষোভের পর রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয়। ১৫ দলীয় জোটে অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো হচেছ:-

১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (হাসিনা)
২। আওয়ামী লীগ (মিজান)
৩। আওয়ামী লীগ (গাজী)
৪। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট্ পার্টি
৫। ন্যাপ (মোজাফ্ফর)
৬। ন্যাপ (হারুন)
৭। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
৮। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)
৯। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
১০। গণআজাদী লীগ
১১। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
১২। একতা পার্টি
১৩। সাম্যবাদী দল (তোয়াহা)
১৪। সাম্যবাদী দল (নগেন)
১৫। মজদুর পার্টি

পরবর্তীতে বিএনপি-র নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭ দলীয় জোট। সাত দলীয় জোটের শরিক দলগুলো হচেছ:-

১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
২। ইউ, পি, পি
৩। কমিউনিস্ট লীগ
৪। কৃষক শ্রমিক পার্টি
৫। জাতীয় লীগ
৬। গণতান্ত্রিক পার্টি
৭। ন্যাপ

Dhaka University Institutional Repository

এ দুটি জোট ১৯৮৩ সালে পাঁচ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। দাবিগুলো হচ্ছেঃ -

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে মৌলিক অধিকার প্রদানসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে সকল বাধা নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩। দেশে অন্য কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই আগামী শীত মওসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসাতে হবে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সকল জাতীয় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারনে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার বিচার, দোষীদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এরশাদ সরকারের 'বৈধতা অর্জন' কৌশলের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এ দুটি জোট চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[২৪] বিরোধী দলের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতি করার অনুমতি প্রদান করে। '৮৩ সালের ২৮শে নভেম্বার বিরোধী দলের উদ্যোগে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয়। এ সময় পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সংগে সংঘর্ষে ২জন নিহত ও বহু আহত হয়।[২৫] ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ সরকার উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। বিরোধী দলগুলো উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১লা মার্চ '৮৪ বিরোধীদলের উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়।[২৬] বিরোধীদলের বলিষ্ঠ দাবি ও আন্দোলনের সামনে এরশাদ উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হন। '৮৪ সালের জানুয়ারিতে এরশাদ রাজনৈতিক

দলগুলোকে সংলাপে বসার আহবান জানান। প্রথম পর্যায়ে প্রধান বিরোধী জোট ও দলগুলো সংলাপে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন ও অখ্যাত ৫২ টি দলের সাথে এরশাদ অর্থহীন সংলাপ চালান। উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার পর ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াত সংলাপে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে সংলাপের পাশাপাশি আন্দোলন অব্যহত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। এরশাদের সাথে বিরোধী দলগুলোর সংলাপ সফল হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে সকল বিরোধী দল তা প্রত্যাখান করে। '৮৪ সালের শেষ দিকে আন্দোলন জোরদার করা হয়। এ বছরের ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় ১৫ দল, ৭দল এবং জামায়াতের উদ্যোগে ৩টি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমাবেশের পর আন্দোলন আরো তীব্র হতে থাকে। এরশাদ সরকার ২১শে ডিসেম্বর আবার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আন্দোলনের মুখে এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের তারিখ ৬ই এপ্রিল '৮৫ পুনঃ নির্ধারণ করেন। কিন্তু ১লা মার্চ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেঃ এরশাদ রেডিও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ২১শে মার্চ '৮৫ গণভোটের তারিখ ঘোষণা করেন। একই ঘোষণাই দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দী করা হয়। ১৯৮৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাচন। বিরোধী দলগুলো উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। গ্রেফতার, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মধ্যে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ ও ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি শরিকদল এবং জামায়াত এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে জাসদ, বাসদ এবং ওয়ার্কার্স

Dhaka University Institutional Repository

পার্টিসহ ৫টি বামদল ১৫ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে আসে এবং পরবর্তীতে ৫ দলীয় জোট গঠন করে। নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই, ভোট ডাকাতি এবং মিডিয়া ক্যুর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা সংসদের ভেতর এবং বাইরে আন্দোলন অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১০ নভেম্বার, ৮৬ সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বিল পাস করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণসহ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বার পর্যন্ত গৃহীত সকল কার্যক্রমকে বৈধ হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বিল পাসের সময় আওয়ামী লীগের ৭২জন এম.পি এবং জামায়াতের ১০ জন এম.পি সংসদ অধিবেশ বর্জন করেন।[২৭] ১৯৮৭ সালের ২৪শে জুন বিরোধী দলের আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দিন। ঐ দিন আন্দোলনকারী জোট ও দলগুলো এক দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে আর তা হচ্ছে এরশাদের পদত্যাগ। ১৫ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। বিরোধী জোট ও দলসমূহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঐক্যবদ্ধভাবে বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এইদিন হরতাল আহবান করে।

এ সময় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে। অক্টোবর মাস থেকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো তীব্রতর এবং ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া ও আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা চালানো হয়। ২৮শে অক্টোবর '৮৭ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদের বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২৮] দু'নেত্রীর বৈঠক সে সময় আন্দোলনের নতুন গতি সঞ্চার করে। বিরোধী জোট ও দলের পক্ষ থেকে '৮৭'র ১০ নভেম্বার ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এদিন ঢাকায় বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতের উদ্যোগে তিনটি বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সময় সকল মহল থেকে দাবী ওঠে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে রাজপথের আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য। সংসদে প্রধান বিরোধীদল পদত্যাগের

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দে ছিল। ২৪শে নভেম্বার বেগম জোহরা তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে সংসদ থেকে দলীয় সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু দলের সংসদীয় দলের সভায় উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করা হয় এবং কারারুদ্ধ শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।[২৯] আন্দোলনের এ প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন মহলের দাবির প্রেক্ষিতে জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ '৮৭'র ৩রা ডিসেম্বর ৩য় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। জামায়াতের সংসদ সদস্যদের এই পদত্যাগের ঘটনা সকল মহলে প্রশংসিত হয়। সরকার এরপর ৬ই ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং একই সাথে পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।[৩০]

১৯৮৮ সালের ১লা জানুয়ারি আবারো দু'নেত্রীর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে। ২৪শে জানুয়ারি শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি নিহত হয়। ব্যাপক সন্ত্রাস এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় চট্টগ্রাম শহরে। এর প্রতিবাদে পরের দিন চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয় এবং ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার শহীদ মিনারে শোকসভার আয়োজন করা হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সরকার ৩রা মার্চ ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। প্রধান বিরোধী জোট ও দল এ নির্বাচন বয়কট করে। ১৯৮৮ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলন কিছুটা শিথিল ছিল। বরং আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল। বিএনপি অভ্যন্তরীণ সংকটে নিপতিত হয়। বেগম জিয়া ৩রা জুলাই ওবায়দুর রহমানকে সরিয়ে ব্যরিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারকে দলের মহাসচিব নিযুক্ত করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ওবায়দুর রহমান, ব্যরিস্টার আবুল হাসনাতসহ পাল্টা বিএনপি গঠন করেন। আওয়ামী লীগ জামায়াত ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের (পরবর্তীতে শিবির) বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য বিবৃতি প্রদান করে। পরিণামে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত ও শিবিরের কর্মীদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ বাধে। ১৮ই অক্টোবর '৮৮ আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা পরোক্ষভাবে জামায়াতকে আক্রমণ করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী শক্তির সাথে কোনক্রমেই ঐক্য হতে পারেনা।[৩১] ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জামায়াত বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ৫ এপ্রিল শেখ হাসিনা জামায়াতের বিরুদ্ধে সকল শক্তি প্রয়োগের আহবান জানান।[৩২]

১৯৮৮ সালের বন্যাউত্তর পরিস্থিতি, আন্দোলনরত দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য এবং অন্তঃদলীয় কোন্দলের ফলে ১৯৮৯ সালেও বিরোধীদলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। ৩১শে অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রিট্যারি জেনারেল সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক আন্দোলনে শেখ হাসিনার উদাসীনতার সমালোচনা করেন।[৩৩] ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন বাংলদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাথে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষ বাধে। ১৯৮৯ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর চাইতে বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ছাত্রদের আন্দোলন বেশি সক্রিয় ছিল। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭দলীয় জোটের সাথে ৫ দলীয় জোটের সম্পর্ক অনেকটা গভীর হয়। আন্দোলনের প্রশ্নে তারা ২৯শে ডিসেম্বর এক বৈঠকে মিলিত হয়। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনমুখী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না দিলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো উপজেলা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ভোটারবিহীন ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশ গ্রহণ ব্যতীত নির্বাচনে গঠিত ৪র্থ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সকল মহলের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে। মে মাসে বিভিন্ন দল ও জোটের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় আন্দোলনকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জোট ও দলের লিয়াজোঁ কমিটিগুলোকে আবার পুনর্গঠন ও সক্রিয় করা হয়। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯০ বিভিন্ন জোট ও দল পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হরতাল পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত আন্দোলন এবং এরশাদের পতন ঃ

অক্টোবরের শুরু থেকে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। ১০ অক্টোবর '৯০ আন্দোলন নতুন পথে অগ্রসর হয়। ৮দল, ৭দল ও ৫দলীয় জোট সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ দিন পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং বিরোধী দলীয় কর্মীদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে। কমপক্ষে ৫ জন বিরোধী দলীয় কর্মী নিহত এবং খালেদা জিয়াসহ শতাধিক আহত হয়।[৩৪] ২৫শে অক্টোবর রাজপথ রেলপথ অবরোধের কর্মসূচী পালিত হয়। ১০ নভেম্বার সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সারাদেশে পালিত হয় হরতাল। ১০ অক্টোবরের ঘটনার পর 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' (APSU) গঠিত হয় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বৈরশাসক এরশাদ থেকে জাতিকে মুক্ত না করা পর্যন্ত 'ছাত্র ঐক্য' আন্দোলন অব্যহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয় সময়ই প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ দেশের ছাত্র সমাজ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলন, '৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, '৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। এদেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলতঃ ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা এরশাদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করে। এরপর ১৫দলীয় জোটের ছাত্র সংগঠনগুলো 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এবং সাতদলীয় জোটের ছাত্র সংগঠনগুলো 'সংগ্রামী ছাত্র জোট' এর ব্যানারে এরশাদ বিরোধী প্রতিটি কর্মসূচীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জামায়াতের কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়াও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজস্ব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর ঢাকার সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের গুলিতে বিরোধী দলীয় ছাত্রকর্মী জেহাদ নিহত হয়। এরই প্রতিক্রিয়া

হিসেবে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ২২ ছাত্র সংগঠন মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠন করে। ১০ই নভেম্বার '৯০ হরতাল উত্তর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এবং ইসলামী ছাত্র শিবির বিরোধী জোট ও দলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১১ থেকে ২১শে নভেম্বার '৯০ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৩৫] কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ চালু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, জেলা পরিষদ কার্যালয় ঘেরাও, ছাত্র সমাবেশ, স্বৈরাচার এবং এর দোসরদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ পালন, ২০ও ২১শে নভেম্বার '৯০ দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালন প্রভৃতি। সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। ১০ ও ১১ই অক্টোবর '৯০ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে পরপর দু'দিন শেখ হাসিনার 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য বিনষ্টের আশঙ্কা দেখা দিলে ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও (ডাকসু) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এরশাদের দুঃশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১লা অক্টোবর ডাকসু'র আহবানে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের 'ঐতিহাসিক ছাত্র কনভেনশন' ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সকল দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সম্মিলিত প্রয়াসের তাগিদ থেকে ডাকসু ছাত্র কনভেনশন আহবান করে। ঐতিহাসিক এ কনভেনশনে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে ১২ দফা দাবি উত্থাপন এবং তা বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।[৩৬] এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ বিরোধীদলের ছাত্র কর্মীরা অধিক নির্যাতন ভোগ করে। ১১ই অক্টোবর '৯০ ডাকসু এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের যৌথ মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া

Dhaka University Institutional Repository

হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয় ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান, ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, ডাকসু জিএস খায়রুল কবির খোকন, এজিএস নাজিমুদ্দিন আলমসহ অন্যান্য ছাত্র নেতা। মারাত্মক আহত অবস্থায় সবাইকে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল ত্যাগের পর পরই আহত ছাত্র নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[৩৭] এক পরিসংখ্যানে ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সালের ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিহত ছাত্র জনতার সংখ্যা ১২৩ উল্লেখ করা হয়।[৩৮] এর অধিকাংশই বিরোধী দলীয় ছাত্র কর্মী। অবশেষে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের চাপের মুখে ৮দল, ৫দল ও ৭দলীয় জোট ১৯ নভেম্বার এক যুক্ত ঘোষণা প্রদান করে। সংক্ষেপে যুক্ত ঘোষণার দাবিগুলো ছিল নিম্মরূপ ঃ

১. বিরোধী দলগুলো এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচন শুধু বর্জনই করবেনা বরং প্রতিহতও করবে।

২. এরশাদকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বস্ততা ফিরিয়ে আনবে এবং সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে।

৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।[৩৯]

এই যুক্ত বা যৌথ ঘোষণা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের একটি মাইল ফলক ছিল। দীর্ঘ সময় পর বিরোধী জোট ও দলগুলো আন্দোলন প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করে। এতে বিভিন্ন পেশাজীবী মহলসহ গণমানুষের মনে আন্দোলনের সফলতার ব্যাপারে আশার সঞ্চার ঘটে। ২৬শে নভেম্বার সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকার বিরোধী দলের নতুন করে গতি পাওয়া আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য আগের মত নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। হরতালের পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে পেশাজীবী সংগঠনের নেতা ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন নিহত হন। ডাঃ মিলনের হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ঢাকা নগরী বিক্ষোভে মেতে ওঠে। ২৭ নভেম্বার দেশের জরুরি অবস্থা এবং রাতে কার্ফ্যু জারি করা হয়। নেতা-নেত্রীদের গ্রেফতারের নির্দেশ আসে সরকারের পক্ষ থেকে। সংবাদপত্রের ওপর জারি করা হয় কড়া নির্দেশ। দেশে জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ দেশব্যাপী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখে। দেশ কয়েকদিন পত্রিকাবিহীন ছিল। এরশাদের পদত্যাগ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করে। ঢাকাসহ সারা দেশের বড় বড় শহরগুলোর রাস্তায় জরুরি অবস্থা এবং কার্ফ্যু ভঙ্গ করে জনতার মিছিল বের হয়। সকলের একই স্লোগান-এরশাদের পদত্যাগ। রেডিও টেলিভিশনের শিল্পীরা, সংবাদ পাঠক-উপস্থাপকগণ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রেডিও টেলিভিশনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। এরশাদ ভীত হয়ে পড়েন। সর্বশেষ এরশাদের একমাত্র ভরসা সেনাবাহিনীর সমর্থনও এরশাদ লাভ করতে ব্যর্থ হন।[৪০] অবশেষে ৩রা ডিসেম্বর, '৯০ রাতে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, তিনি সব দাবি মেনে নেবেন। একই দিন সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। নির্বাচনের ১৫দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর এই ঘোষণা বিরোধী দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলনা। সবাই জেঃ এরশাদের তাৎক্ষণিক পদত্যাগ দাবি করলেন। উপায়ান্তর না দেখে এরশাদ বিরোধী জোট ও দলের দাবি মেনে নেন। ৪ঠা ডিসেম্বর বিরোধী তিন জোট ও দল গুলোর পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে কেয়ার-টেকার সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ সুপ্রীম্ কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৪১] এভাবে দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর জেঃ এরশাদের পতন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংকেতঃ

১। Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum*, University Press ltd. Dhaka, 1993, page –II

২। The Bangladesh Observer, November 29,1981

৩। এরশাদের এ সকল প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দলের নিন্দা ও প্রতিক্রিয়া দেখুন, সংবাদ নভেম্বার ৩০, ডিসেম্বর ১.২.৩ ১৯৮২, হলিডে, জানুয়ারি ৩, ১৯৮২.

৪। *Far Eastern Economic Review*, january 8, 1982.

৫। The text of Ershard's speech is contained in *'Bangladesh Today`*, published by the High Commission of Bangladesh, London. March 15-31, 1982.

৬। Borhanuddin Ahmad, *The Generals of Pakistan & Bangladesh* (New Delhi. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1993) P- 123.

৭। দেখুন, মেজর রফিকুল ইসলাম-*স্বৈরশাসনের নয় বছর*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা। ১৯৯১, পৃঃ ৫১.

৮। ডঃ মোহাম্মদ সোলায়মান, *"রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট: এরশাদের শাসনকাল"*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা -১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৯

৯। Muhammad A.Hakim, *Ibid* p-20

১০। Iftekharuzzaman & Mahbubur Rahman, "Transition & Democracy in Bangladesh: Issues and Outlook" paper presented at the seminar on " Transition & Democracy in Bangladesh. "Organised by BIISS at Dhaka, P-21.

১১। Mahbubur Rahman "Elite Formation in Bangladesh Politics" in *BIISS Journal*, Dhaka 1989. Vol.10 No-4

১২। Peter J. Bertocci, "Bangladesh in 1985" P-229 Cited in Muhammed A. Hakim *The Shahabuddin* Interregnum. ~~Page~~ – 22.

১৩। দেখুন, Syed Sirajul Islam. "Bangladesh in 1986: Entering a new phase" *Asian Survey*. 27.2 February 1987 P-164

১৪ । *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, মে-১৬, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২০

১৫ । *সাপ্তাহিক রোববার*, মে-১১, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা -১১

১৬। *Asia Week*, May18, 1986, cited in Mohammad A. Hakim, The Shahabuddin Interregnum" Page – 27

১৭ । দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *নির্বাচন কমিশন, রিপোর্ট : জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৯৮৬ইং, (ঢাকা-১৯৮৮)

১৮। *Far Eastern Economic Review*, November 27, 1986. P-37

১৯। Samina Ahmad, "Politics in BD: The paradox of Militarry Intervention" *Regional Studies*, 9:1 (Winter 1990-1991) p-58.

২০। দেখুন, Mahbubur Rahman, "Elite Formation in Bangladesh Politics," *BIISS Journal*, Dhaka, Vol. 10 No-4. 1989

২১। Muhammad A. Hakim, "The Fall of Ershad Regime & its aftermath," *Regional Studies*. Vol. No1 winter 1991-92 P-71

২২ । Lt. General Hossain Mohammed Ershad "Role of the Military in Bangladesh" *Holiday*, December 6, 1981, উদ্ধৃত: ডঃ মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট,এরশাদের শাসনকাল", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*,১৯৯৩,পৃঃ ৩৭

২৩ । *নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট*, ঢাকা, ১০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জানুঃ '৯৭ পৃঃ ২১

২৪ । Bhuiyan Monoar Kabir, "Collapse of the Top-down Legitimisation Strategy and the dilemmas of Bottom-up transition in Bangladesh. 1986-88", *Bangadesh Political Studies*, Vol-xvi, 1994. P-37.

২৫ । সালাহ উদ্দিন বাবর, "বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর", *নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট*, জানু, '৯৭ পৃঃ২১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উল্লেখযোগ্য দলগুলো হচেছ-জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। এছাড়া মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুজুর) নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ইসলামপন্থী কয়েকটি ছোট দল এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। মিছিল, সমাবেশ, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা, গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান ইত্যাদির মাধ্যমে দলগুলো ভূমিকা রাখে। এছাড়া জনমতকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশব্যাপী প্রচারপত্র, পুস্তিকা বিলি করে।

জামায়াতে ইসলামী পরিচিতি ঃ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী ইসলামী রাজনৈতিক দল। এ দলের সূচনা হয়েছিল অবিভক্ত ভারতে ২৫শে অগাস্ট, ১৯৪১ সালে। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারতে জামায়াত পৃথকভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতের কাজ চলতে থাকে।[১] জামায়াতে ইসলামী নিছক কোন রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় দল নয়। জামায়াত ইসলামকে কোন সন্দেহ সংশয় ছাড়া সম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং জামায়াত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয়ই।[২] মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালিন মুক্তি লাভই জামায়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য। জামায়াতের অন্য সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং কার্যক্রমও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরই অংশ। জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা এর কর্মসূচী থেকে বিচিছন্ন কোন কাজ নয় বরং দাওয়াতের ৩য় দফা এবং কর্মসূচীর ৪র্থ দফা বাস্তবায়নের অনিবার্য দাবি[৩]। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের[৪] মাধ্যমে জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, স্থায়ী কর্মনীতি, দাওয়াত ও স্থায়ী কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রের ৩নং ধারায় এর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালিন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য। গঠনতন্ত্রের ৪নং ধারা থেকে জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি সম্পর্কে জানা যায়। জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি ৩টি। এগুলো হচ্ছে -

১। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কান কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসেলের জন্য জামায়াতে ইসলামী এমন কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।

৩। জামায়াত এর বাঞ্ছিত সংশোধন ও বিপ্লব কার্যকর করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকদের মন মগজ ও চরিত্রের সংশোধন এবং জামায়াতের অনুকূলে

Dhaka University Institutional Repository

জনমত গঠন করবে। যে সকল বিষয়ের প্রতি জামায়াত আহবান জানায় তা সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ৫নং ধারায় বর্ণিত আছে। জামায়াতের তিন দফা দাওয়াতঃ-

১। সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসুলের (সাঃ) আনুগত্য করবার আহবান।

২। ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করে খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহবান।

৩। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করে সমাজ হতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহবান।

জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারা অনুসারে স্থায়ী কর্মসূচী হচেছ ঃ-

১। সকলশ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। ইসলামকে জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাদের জাহিলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও ইসলাম কায়েম করার যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। ইসলামের পুর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কাঙ্খিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও যোগ্যলোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।[৫] বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বিধায় রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে। সনাতন ইসলামিক জীবন দর্শন জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। সে জীবন ধর্ম, রাজনীতি, আইন ও সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং দৈহিকভাবে সম্পর্কিত।[৬] জামায়াতে ইসলামী ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী দল।[৭] বাংলাদেশের অনেক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামকে রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় সকল সরকারই ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষে কথা বলা এবং ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকারীদের একজন গবেষক চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৮] তিনি জামায়াতকে জঙ্গী-সংস্কারবাদী (মৌলবাদী) শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করেছেন জামায়াত তাঁর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (রাঃ) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বুঝিয়েছেন সেভাবে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার চায়।

জামায়াতকে কিছু কিছু দল ও ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক এবং ধর্ম ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের বাম রাজনীতির শীর্ষ বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর জামায়াতকে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে মনে করেন না।[৯] অনেক সীমাবদ্ধতা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও জামায়াত বর্তমানে একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত ইসলামী দল। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আতাউর রহমানের মতে, জামায়াতে ইসলামী বিচিত্র রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত একটি সুসংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত দল। গত এক দশকে জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুনির্দিষ্ট আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে।[১০] বাংলাদেশকে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে

Dhaka University Institutional Repository

সরকার।[১৫] ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতার কারনে ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করে।[১৬] পরবর্তীতে উচ্চতর আদালতের এক রায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয় ১৯৯৪ সালে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা এবং সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৬সালে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশের (পিপিআর) মাধ্যমে ইসলামী দলগুলো আবার তাদের তৎপরতা শুরু করার সুযোগ লাভ করে। জামায়াতের মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৬ সালে জামায়াত এবং আরও কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে ইসলামিক ডেমক্রাটিক লীগ (আই ডিএল) গঠিত হয়। এর মাধ্যমে জামায়াত ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের সংবিধান সংশোধনী আদেশানুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারিত হয়। ১৯৭৮ সালে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ তুলে নেয়া হয়। ১৯৭৯ এর ২৫-২৭ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক সংগঠন 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' প্রকাশ্যভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে।[১৭]

সামরিক শাসন সম্পর্কে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

জামায়াতে ইসলামী একটি গণতান্ত্রিক দল। জামায়াতে ইসলামী সশস্ত্র বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়।[১৮] জনগণের সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করাই জামায়াতের কর্মনীতি। সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে। ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে জামায়াতের জনসমর্থন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সামরিক শাসনের মধ্যে সম্ভব নয়। "স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ না পেলে এদেশে ইসলামের

পথ কিছুতেই বাধামুক্ত হবেনা। তাই জামায়াতে ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করা দ্বীনি কর্তব্য বলে মনে করে"।[১৯] জামায়াত স্বার্থহীন নেতৃত্বের অধীনে সৎ মানুষদের সংগঠিত করে জনগণকে প্রতারণাকারীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে চায়। "এ অর্জনের পথে অগণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে উন্নীত করা যাবে না। এ জন্য আদর্শগত অমিল থাকা সত্ত্বেও জামায়াত অন্যান্য বিরোধীদলের সাথে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ"।[২০]

জামায়াত নীতিগতভাবে সামরিক শাসন বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন কামনা করে। জামায়াত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের ম্যান্ডেট্ নিয়েই ক্ষমতায় যেতে চায়। এ জন্য জামায়াত ১৯৬২ সালের পর থেকে প্রায় সকল (১৯৭৩ সালে জামায়াত নিষিদ্ধ থাকায় বাংলাদেশের ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।) সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। নির্বাচনে ভোট ডাকাতি বা জোরপূর্বক কেন্দ্র দখলের ঘটনা জামায়াত কর্তৃক সংঘঠিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামই জামায়াতের মূল লক্ষ্য নয় বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার ও সমাজের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার একটি উপায়"।[২১]

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকার ইতিহাস ঃ

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এরমধ্যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অধিকতর গ্রহণীয়। আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত শাসকমন্ডলী কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণই হচ্ছে

সকল ক্ষমতার উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন। বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের মূলনীতির তেমন বিরোধ নেই। জনগণের ওপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। ইসলাম রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। জনগণের ইচ্ছা এবং স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করা ইসলামী রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গণতন্ত্রের 'সার্বভৌম' শক্তির উৎস জনগণ, ইসলামে 'সার্বভৌম' ক্ষমতার মালিক হচেছন আল্লাহ। গণতন্ত্রে জনগণ তাদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে আইন প্রণনয়ন করে। ইসলামে আইনের উৎস একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আল কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) এর পথ-নির্দেশিকা। জামায়াতে ইসলামী জনগণের মতামত নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। জনগণের নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তাই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বরাবরই শরিক ছিলো।

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ইসলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।[২২] জামায়াত পাকিস্তান আমলে জেনারেল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। জামায়াত আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিরাট আঘাত হিসেবে অভিহিত করে এবং জনগণের ভোটাধিকার আদায়ের দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করে। সরকার বিরোধী কর্মসূচী পালনের কারনে আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারি জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ৬০

Dhaka University Institutional Repository

জন নেতাকে গ্রেফতার করেন।[২৩] পরবর্তীতে সুপ্রীম্ কোর্ট জামায়াতকে নিষিদ্ধ ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা অন্যায় ও বেআইনী বলে রায় প্রদান করে। ১৯৬৪সাল থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত জামায়াত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন অংশ গ্রহণ করে। ১৯৬৪সালে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামীলীগ, নেজামে ইসলাম ও এনডিএফ এর সমন্বয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী জোট' (COP) গঠন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে জামায়াত আওয়ামী লীগ (৬ দফা বিরোধী অংশ), কাউন্সিল মুসলিমলীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, এনডিএফকে নিয়ে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' (PDM) জোট গঠন করে। ১৯৬৯ সালে আওয়ামীলীগ, ন্যাপ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও PDM এ যোগ দেয়। তখন এ জোটের নামকরণ করা হয় DEMOCRATIC ACTION COMMITTEE (DAC). এ কমিটি আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আন্দোলনের কারণে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় এবং এজন্য বারবার সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করা হয়।[২৪]

আন্দোলনের সূচনা ঃ

জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ আদর্শগত এবং কৌশলগত কারনে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে তথা গণতন্ত্র বহালের আন্দোলনে যথাসাধ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জামায়াত অন্যান্য দলের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এরকম একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বি.এন.পি'র কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল মতিন চৌধুরীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষে।[২৫] এ বৈঠকে বিএনপি'র ক্যাপ্‌টিন্ আবদুল হালিম

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আবদুল মতিন চৌধুরী, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মুহাম্মদ কামারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। '৮৩'র মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠতে থাকে। ছাত্র মিছিলে হামলা ও সংঘর্ষের পর রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক সরকারের ফ্যাসিস্ট আচরণের তীব্র নিন্দা জানায় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের চিন্তাভাবনা জোরদার হয়ে ওঠে। চাপের মুখে বাধ্য হয়ে এরশাদ ১লা এপ্রিল '৮৩ থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' শুরু করার অনুমতি দেন। সে সময় রাজনৈতিক মহলে সংবিধান সংক্রান্ত একটি বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ এবং সমমনা দলগুলো ৪র্থ সংশোধনীর পূর্ববর্তী '৭২ সালের সংবিধান পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তরের দাবি জানায়।[২৬] কেউ কেউ ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান বহালের দাবি তোলেন। এ সময়ে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জাতীয় পরিষদে ও শাসন ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠানা হল।[২৭] বিভিন্ন দলের এ দাবির পরিপেক্ষিতে সামরিক সরকারের শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সামরিক সরকারের হাতে দিলে রাজনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সশস্ত্র বাহিনী রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে এ জাতীয় রাজনৈতিক মত প্রার্থক্য ও বিভেদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।[২৮] শাসনতান্ত্রিক এ বিতর্ক বাদ দিয়ে মুলতবী সংবিধান পুনর্বহালের এবং এর ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহবান জানিয়ে জামায়াত ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর পূর্বেই ১৯৮৩ সালের ২৮শে মার্চ সারাদেশে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। জামায়াতে ইসলামীর বিলিকৃত এ প্রচারপত্র তখন রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগায়। বিলিকৃত প্রচারপত্রের উদ্ধৃতি

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়[২৯] সংবাদ ছাপা হয়। "প্রচারপত্রে বলা হয়, দেশের বর্তমান মুলতবী সংবিধানে হাত দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কেননা সংবিধান জনগণের আস্থা হারালে দেশের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া বর্তমান সংবিধান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রণীত এবং বিভিন্ন সময়ে গৃহীত। সংশোধনের ব্যাপারে যত মতই থাকুক, সেগুলোও কোনটা জাতীয় সংসদে গৃহীত, কোনটা গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত"। তাছাড়া প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সকল সংশোধনসহ বর্তমান মুলতবী সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবচাইতে নিরাপদ পন্থা। সারাদেশে কয়েকলক্ষ প্রচারপত্র বিলি এবং দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ পরিবেশন করায় জামায়াতের এ বক্তব্য সচেতন মহলের নিকট পৌঁছে যায়। লীফ্‌লিট্‌ এর বক্তব্য হুবহু নিন্মে উপস্থাপন করা হলোঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সংলাপ

সামরিক সরকার দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাচ্ছেন। এ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের বিবেচনার জন্য কিছু কথা পেশ করা কর্তব্য মনে করছে।

এক বছর আগে বর্তমান সামরিক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ঘোষণা করেই এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু সরকারি দায়িত্ব এমনই ব্যাপক তৎপরতা দাবি করে যে, স্বাভাবিক ভাবেই কর্মের পরিধি বেড়ে যায়। ফলে জাতীয় আদর্শ, শিক্ষানীতি, পলিটিক্যাল সিস্টেম্‌, সরকার গঠন পদ্ধতি, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের ধরণ, ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সামরিক শাসন নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই আসে। তাই তাড়াতাড়ি গণতান্ত্রিক সরকার বহাল করা সম্ভব হলে ঐসব মৌলিক বিষয়ের মীমাংসার ভার জনগণের নির্বাচিত প্রতনিধিদের হাতে তুলে দেয়া সহজ হয়। সামরিক সরকার ঐসব বিষয়ের মীমাংসা করতে চেষ্টা করলে ভয়ানক জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ, রাজনৈতিক ময়দানে ঐ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক মতভেদ থাকার ফলে সামরিক সরকারের পক্ষে কোন একটা বিশেষ মত সমর্থন করা সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র বাহিনী ও জাতীয় ঐক্য ঃ

সশস্ত্র বাহিনীই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। সামরিক সরকার সশস্ত্র বাহিনী দ্বারাই পরিচালিত বলে এই সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে বাঁচিয়ে রাখা জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। রাজনৈতিক ময়দানে সংগত কারণেই বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মতের সমর্থক দেখা যায়। সশস্ত্র বাহিনীকে এ জাতীয় রাজনৈতিক মত-পার্থক্য ও বিভেদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে জাতি এক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষিত শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সরকার ও কতক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা দুঃখজনক বিতর্ক চালু হয়ে গেল। ১৪ই জানুয়ারি এক ওলামা সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে জেনারেল এরশাদ নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই তাঁর মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি সরকারি কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি। কিন্তু তিনি সরকার প্রধান হওয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত মতকে ১৫টি রাজনৈতিক দল গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি। ফলে ১৫ দলীয় রাজনৈতিক ঐক্য ও তাদের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সাথে সরকারের এক দুঃখজনক সংঘর্ষে পরিবেশ খুবই খারাপ হয়ে পড়লো। অবশ্য পরে সরকারের সদিচছার ফলে পরিবেশ ক্রমে উন্নতির দিকে গেছে।

এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সামরিক সরকার ও জনগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে, রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িত না হওয়াই সামরিক সরকারের মর্যাদার জন্য জরুরি। সামরিক সরকার যদি বিতর্কিত বিষয়ে কোন মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তাহলে সামরিক সরকার স্বয়ং বিতর্কিত হয়ে পড়বে। তাই সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব জনগণের হাতে তুলে দেয়াই নিরাপদ।

নির্বাচনই একমাত্র পথ ঃ

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সবের মীমাংসা জনগণের ময়দানেই হওয়া সম্ভব। এর জন্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনই একমাত্র পথ। বর্তমান সরকার দেশের শাসনতন্ত্রকে বাতিল না করে দূরদৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছে। এখন মুলতবি শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

শাসনতন্ত্রে হাত দিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হবে যে, শেষ পর্যন্ত দেশ কোন্ সংকটে পতিত হয় তা বলা যায় না। কারণ, শাসনতন্ত্র এমন এক পবিত্র দলিল যার ওপর জনগণের আস্থা না

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে দেশে কোন ক্রমেই স্থিতিশীলতা আসতে পারেনা। যে শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সে শাসনতন্ত্রই স্বাভাবিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়। জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া শাসনতন্ত্র কখনো ঐ মর্যাদা পায় না।

দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত। এ পর্যন্ত যে কয়েকবার একে সংশোধন করা হয়েছে তার কোনটাই আনকনস্টিটিউশন্যাল (শাসনতন্ত্র বহির্ভূত) পদ্ধতিতে করা হয়নি। এসব সংশোধনীর পক্ষে ও বিপক্ষে যত মতই থাকুক, এসব সংশোধনী আইনসম্মত বলে স্বীকার করতে সবাই বাধ্য। কারণ, এসব সংশোধনী হয় জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে আর না হয় গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তাই বর্তমান শাসনতন্ত্রে যে কোন রকম সংশোধনী আনতে হলে জাতীয় সংসদের প্রয়োজন।

যারা শাসনতন্ত্রে সংশোধনী আনতে চান তাদের জন্য একমাত্র সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমই হলো জাতীয় সংসদ। সংলাপের মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা ব্যাপক। কেউ চান সংশোধন পূর্বকালীন শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৪র্থ সংশোধনীর পূর্বের শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৫ম সংশোধনীর পরবর্তী, আর কেউ ৬ষ্ঠ সংশোধনীসহ চান। এর মীমাংসা কে করবে এবং কীভাবে হবে?

আগামী শীতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ

সরকার যদি আগামী শীত মওসুমেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য সময় ঘোষণা করে তা হলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ নির্বাচনমুখী হয়ে পড়বে। নির্বাচনের গুরুত্ব সরকার অনুভব করছে বলেই এ সম্পর্কে একটা সময় ঘোষণা করেছে। সে অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন এখন থেকে আরও দু'বছর পর অনুষ্ঠিত হবার কথা। দেশ, জাতি ও সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে নির্বাচন এতটা বিলম্বিত হওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারলে সামরিক সরকার সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জনগণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আপন মর্যাদায় বহাল থাকবে।

ইতোমধ্যে যেসব ইস্যু নিয়ে ময়দানে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এ সবই নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এর কোন বিকল্প পথ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যও নির্বাচনের মাধ্যমেই সফল হতে পারে। এরও কোন বিকল্প উপায় নেই। নিয়মিত নির্বাচন হতে থাকলে দলের সংখ্যা অবশ্যই কমতে থাকবে। নির্বাচনের অভাবেই এ দেশে দলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে।

রাজনৈতিক সংলাপের দ্বারা কোন মৌলিক বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা হতে পারে না। বরং এ দ্বারা রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হবারই আশংকা। বিভিন্ন দল প্রত্যেক বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলে সরকার কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? তাই সংলাপের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে মীমাংসায় পৌঁছাবার সুযোগ দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

ফারাক্কা সমস্যা ও নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম করার পথে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে। বিশেষ করে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের জন্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খালের প্রস্তাব বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এ জাতীয় ইস্যুতে সবকারের পেছনে গোটা জাতির সমর্থন প্রয়োজন এবং ব্যাপক গণ-সমর্থন যোগাড় করা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে সহজ। সশস্ত্র বাহিনী হলো দেশের সর্বশেষ সম্বল। কূটনৈতিক দরকষাকষির দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর হাতে থাকলে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থন পুষ্ট হয়ে জনগণের পক্ষ থেকে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে তা সামরিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ কারণেও নির্বাচন ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন।

এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে, দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ইসলামকে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হোক, আর বিদেশী আদর্শের অনুসারী হওয়ার দরুনই হোক, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের একটি ক্ষুদ্র সক্রিয় অংশের ঈমান আকিদা দেশের শতকরা ৮৫ জন নাগরিকের অনুরূপ নয়। তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তারা সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মতৎপর। রাজনৈতিক অঙ্গণে তারা বহু দলে বিভক্ত হলেও কুরআন সুন্নার বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ।

তাই বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের বিষযটাকে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে মীমাংসা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর মীমাংসা গণতান্ত্রিক পথেই হবে। বিভিন্ন অজুহাতে জনগণের হাত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করা না হলে নির্বাচনের স্বাভাবিক পথে জনগণই এ বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

রাজনৈতিক সংলাপের আলোচ্য বিষয় ঃ

বর্তমান রাজনৈতিক সংলাপের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামরিক সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে বিষয়টি হলো, "রাজনৈতিক আচরণ বিধি"। রাজনৈতিক ময়দানে সুস্থ গণতান্ত্রিক আচরণ বিধিবদ্ধ করার কাজটি এ সংলাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হলে দেশের বিরাট কল্যাণ হতে পারে। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত আচরণ বিধি সরকারের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

এ বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে একটিমাত্র বিষয় মনে হলেও এর ব্যাপকতা এত বিরাট যে, সংলাপের মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় লেগে যেতে পারে। বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক হবার কারণে এ কাজটি নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের আশা। এ কাজটি এত গুরুত্ববহ যে, এর সুফল দেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে পারে।

সর্বশেষ আমরা দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আবেদন জানাচ্ছি যে, সবাই আল্লাহ পাকের নিকট কাতরভাবে দোয়া করুন যাতে সামরিক সরকার এ বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে সন্ত্রাস ও সংকটের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

প্রকাশকালঃ ১০ই জামাদিউস্‌সানী ১৪০৩ হিজরী,
২৬শে মার্চ ১৯৮৩ইং,
১১ই চৈত্র, ১৩৮৯ বাং

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭

জামায়াতের বক্তব্য যুক্তিসংগত হওয়ায় পরবর্তীতে শাসনতান্ত্রিক পুনর্বহালের প্রশ্নে জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামীলীগও এ সংক্রান্ত তার দাবি পরিত্যাগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি

১৯৮৩ সালের ১৪.১৫.১৬ ও ১৭ অক্টোবর ঢাকার রহমত উল্লাহ মডেল্ হাইস্কুলে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের চারদিনব্যাপী সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়[৩৩] "এ সম্মেলন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী সময়সূচীকে সত্যিকার গণতান্ত্রিক নীতির উপযোগী মনে করেনা। দেশের শাসনতন্ত্রকে মুলতবি রেখে দুর্নীতি দূর করার সাময়িক উদ্দেশ্য ঘোষণা করে সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। প্রথমে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেও বর্তমান সরকার মুলতবী শাসনতন্ত্রকে বহাল রাখার গণদাবি মেনে নিয়েছে। এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদই দেশ পরিচালনার অধিকারী। বর্তমানে একজন প্রেসিডেন্ট গদীনসীন আছেন। যদিও তিনি নির্বাচিত নন। কিন্তু জাতীয় সংসদের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই মুলতবী শাসনতন্ত্র বহাল করতে হলে জাতীয় সংসদের নির্বাচনই প্রথম হওয়ায় স্বাভাবিক যাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের হাতে সরকারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। এ সম্মেলন বর্তমান সরকারের ঘোষিত নির্বাচনের সময়সূচীতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেয়া গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের সহায়ক নয় বলে মনে করে। সরকার গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই এ ব্যবস্থাকে জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু আইয়ুব খানের আমল থেকে জাতির এ তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত লোকদের রাজনৈতিক স্বার্থের লোভ দেখিয়ে সামরিক একনায়কগণ দেশের সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের সমন্বয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং তাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের নামে শাসনতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। এ সম্মেলন সবদিক বিবেচনা করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সামরিক শাসন দ্রুত প্রত্যাহার করা অত্যাবশ্যক মনে করছে এবং সে লক্ষ্যে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি

Dhaka University Institutional Repository

জানাচেছ। সম্মেলন আশা করে, সরকারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হবে এবং সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের পথ সুগম করবে।"

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কটের আহ্বান ঃ

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এরশাদ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তিনি ঘোষণা করেন, '৮৪'র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জামায়াত এরশাদের এ ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং জরুরি কর্ম পরিষদের বৈঠক আহবান করে এ ঘোষণাকে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে। "জামায়াতে ইসলামী '৮৪'র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণাকে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে প্রত্যাখান করেছে। জরুরি বৈঠকে (২৭ শে অক্টোবর '৮৩ অনুষ্ঠিত) জামায়াতের কর্মপরিষদ অবাধ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্বার্থে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানায়।"[৩১]

কেয়ার-টেকার সরকার দাবি ঃ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম কেয়ার-টেকার সরকারের দাবি জানানো হয়। আন্দোলনরত ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট তখনও পর্যন্ত কেয়ার-টেকার বা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেনি। ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বার প্রকাশ্য রাজনীতির শুরুতেই জামায়াত বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট্ এ আয়োজিত এক বিরাট গণসমাবেশে এরশাদ সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান উপর্যুক্ত সমাবেশে কেয়ার-টেকার সরকারের ফর্মূলা জামায়াতের পক্ষ থেকে উত্থাপন করেন। তিনি একটি অরাজনৈতিক কেয়ার-টেকার সরকার গঠন করে এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরে দাড়ানোর দাবি জানান। সামরিক আইন প্রত্যাহার, শাসনক্ষমতা প্রধান বিচারপতির কাছে হস্তান্তর এবং সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি জানানো হয় উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গণসমাবেশ থেকে।[৩২] '৮৪'র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সংলাপেও জামায়াত কেয়ার-টেকার সরকারের দাবি জানায় এবং ১৫ ও ৭ দলীয় জোটকেও এ দাবি জানানোর আহবান জানায়।[৩৩] কিন্তু ১৫ ও ৭দলীয় জোট এ দাবি অন্তর্ভুক্ত করেনি। জোট দুটি ভিন্ন ভাষায় এ দাবি জানায় ১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর। ৭ দলীয় জোট '৮৪'র ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে ৫ দফার অতিরিক্ত ৭টি পূর্বশর্ত আরোপ করে '৮৫ সালের মার্চের মধ্যে নির্বাচন দাবি করে। অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের দাবি।[৩৪] ১৫ দলীয় জোটও এদিন বায়তুল মোকাররমের সমাবেশে ৮৫'র এপ্রিলের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানায় এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে ৫ দফা ছাড়াও ৬টি পূর্বশর্ত আরোপ করে। এরমধ্যে নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবি ছিল।[৩৫] উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭দলীয় জোট সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলও একই ৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জামায়াতের তৎকালীন অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।[৩৬] '৮৪'র এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সরকারের সাথে সংলাপে কেয়ার-টেকার সরকারের প্রস্তাবটি বিবেচনায় আনার জন্য তিনি আন্দোলনরত দল ও জোট সমূহের প্রতিও আহবান জানান। কিন্তু আন্দোলনরত দল ও জোটগুলো কেয়ার-টেকার সরকার দাবির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় এরশাদের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপে ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট কেয়ার-টেকার সরকারের কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংলাপ : আনুষ্ঠানিকভাবে কেয়ার-টেকার সরকারের প্রস্তাব

এরশাদ ঘোষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়ে উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেন। অপরদিকে বিরোধীদলগুলোকে সংলাপে বসার আহবান জানান। জামায়াত এবং ১৫ ও ৭ দলীয় জোট প্রথম সংলাপে অংশ গ্রহণ করেনি। প্রথম পর্যায়ের সংলাপে ছোটখাট ৫২টি দল অংশ গ্রহণ করে। জামায়াত এবং ৭ ও ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে জানানো হল, উপজেলা নির্বাচন বাতিল করা না হলে তারা সংলাপে যাবে না। আন্দোলনের চাপের মুখে এরশাদ উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের কর্মপরিষদের ৭ সদস্য বিশিষ্ট ডেলিগেশন্ সরকারের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করে। সংলাপে জামায়াতের মূল দাবিই ছিল সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কেয়ার-টেকার সরকার গঠন। জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ার-টেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে এও আশংকা প্রকাশ করা হয়, সংসদ নির্বাচনের দাবি মানার পরও যদি কেয়ার-টেকার সরকার গঠন করা না হয় তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না। "সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিটি মানা সত্ত্বেও সরকার যদি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকার গঠনের ব্যবস্থা না করে তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না।"[৩৭] সংলাপে জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ার-টেকার সরকার প্রশ্নে দুটো বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একটি হচ্ছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নেতৃত্বে অরাজনৈতিক সরকার গঠন। সংলাপে জামায়াত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, "আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় না। এমন একটি সরকার থেকেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায়, যে সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিগণ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নেতা

Dhaka University Institutional Repository

থাকবেন না এবং সরকারি পদে থাকাকালে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। আমরা নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে অরাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবি করছি এর জন্য দুটো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে। সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিলে তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। অথবা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজেও অরাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্বে দিতে পারেন। এ অবস্থায় সরকারকে অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ মর্যাদায় উন্নীত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নিতে হবেঃ

১. তিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা দিতে হবে।

২. তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।[৩৮]

১০ এপ্রিল প্রথম বার সংলাপের পর ১৭ এপ্রিল জামায়াত নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বার সরকারের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করেন। সরকারের সাথে সংলাপের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি পুনরায় ব্যক্ত করেন। প্রেস ব্রিফিং এ তিনি বলেন, যদি বিরোধী দলগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হত তাহলে সংলাপ তাড়াতাড়ি এবং কার্যকর করা যেত।[৩৯] উল্লেখ্য, সংলাপের স্বার্থে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল সম্মিলিতভাবে সংলাপে অংশ গ্রহণ অথবা কেয়ার-টেকার সরকারের একই দাবি উত্থাপনের জন্য।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে জামায়াত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঃ

২১শে মার্চ '৮৫ গণভোট অনুষ্ঠানের পর ১লা অক্টোবর থেকে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। ১লা জানুয়ারি '৮৬ থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে বাধা নিষেধও প্রত্যাহার করা হয়। জামায়াতসহ বিরোধীদল ও জোটের আন্দোলনের মুখে সরকার সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। সরকার ২৬ এপ্রিল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। বিরোধীদলগুলো এরশাদ সরকারের ঘোষণা প্রত্যাখান করে। এক পর্যায়ে দু'জোট নেত্রী ১৫০+১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সরকার আইন[৪১] করে সে প্রচেষ্টা ব্যাহত করে দেয়। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখের একদিন পূর্বে আওয়ামীলীগ ও ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের এক ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে এক মত ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৪২] ২১শে মার্চ '৮৬ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন, বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাঁর সরকার কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ক) উপযুক্ত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনকে পরামর্শ দান, খ) নির্বাচন প্রার্থী মন্ত্রীবর্গ পদত্যাগ করবেন। গ) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও অফিস এবং সামরিক আইন আদালত বিলুপ্ত করবেন[৪৩] ইত্যাদি। যুগপৎ আন্দোলনের শরিক জামায়াতে ইসলামীও তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ৯ এপ্রিল ১৯৮৬ ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বৈঠকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আন্দোলনের অংশ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচনী দুর্নীতিকে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মজলিশে শূরা তিন বছরের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন পর্যালোচনা করে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলনকে নব পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সমীচীন বিবেচনা করে এ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৪] তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ২৮টি রাজনৈতিক দল থেকে ১০৭৪ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল ৪৫৩ জন।[৪৫] তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন মারাত্মক সন্ত্রাস এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। ব্যালট ডাকাতি, সন্ত্রাস, মিডিয়া ক্যু এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনের দিন কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হয়।[৪৬] নির্বাচনে সরকারের গনভোট ডাকাতির চিত্র উন্মোচিত হয়। নির্বাচনের দিন বিকেলেই জাতীয় প্রেস ক্লাবে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ব্যালট ডাকাতির মাধ্যমে সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর স্বনামে জামায়াত প্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসরের ৭৬টি আসনে জামায়াত প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ১০টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ১৫টি আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।[৪৭] জামায়াত সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি সীট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আওয়ামীলীগ ৭৬টি আসন পেয়ে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৬ সালে ৭ই 'মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নোর সারণি থেকে জানা যায়।

মে '৮৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ফলাফল[৪৮]

দল/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন	বিজয়ী আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত মোট ভোট	প্রাপ্তভোটের শতকরা হার (প্রদেয় মোট ভোটের ভিত্তিতে)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০০	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	৭৬	২৫.৩৩	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	৩.৩৩	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৫	১.৬৬	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৫	১.৬৬	২,৫৯,৭২৮	০.৯১

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪	১.৩৩	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	০৪	১.৩৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	০৩	১.০০	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	০৩	১.০০	১,৯১,১০৭	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০৩	১.০০	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি	০২	০.৬৬	২,০৩,৩৬৫	০.৭১
অন্যান্য দল	০০	০০	৪,৯০,৩৮৯	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯

১৯৮৬ সালের ৫ই জুলাই জামায়াত সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। ১০ জুলাই'৮৬ সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও জামায়াত সে অধিবেশনে যোগ দেয়নি। অধিবেশনের দিন রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে জামায়াত এবং বিএনপি। রাজপথে আন্দোলন এবং সংসদের ভেতরে সরকারের বিরোধিতা দুটোই চলতে থাকে। সপ্তম সংশোধনী পাস হওয়ার পর জামায়াতের মজলিশে শূরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংসদ সদস্যদের সংসদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি জামায়াতের দশ জন সদস্য না যান তাহলে সরকার পরবর্তীতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে ভোট ডাকাতির সাহায্যে ঐ সব আসনে দলীয় প্রার্থী দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সমস্যা সমাধান করে নিতে পারে। তাই সংসদে গিয়ে সরকারের বিরোধিতার ভূমিকার জন্য জামায়াত সংসদ সদস্যগণকে সংসদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৯] সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজনে সংসদ থেকে সদস্যগণ পদত্যাগ করবেন এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি জামায়াত সদস্যগণ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত যোগদান করেন। সংসদে জামায়াত সরকারের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নীতি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রস্তাবে বক্তব্য দিতে গিয়ে জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, "মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছেন খুব জোরে সোরে। আমিও জোরে সোরে বলতে চাই, যারা বন্দুক দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন, তাদের পক্ষে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। .....দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য যে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেই দুর্নীতি যদি চলে যায় তাহলে হয়তো ধন্যবাদ এসে যেত এবং সেটা শোভা পেত। কিন্তু দুর্নীতি মাননীয় স্পীকার, এখন কি আছে না নেই, এটা জাতির কাছে প্রশ্ন। যদি থাকে তাহলে সেই কথা আর ধোপে টিকে না।"[৫০]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জিলা পরিষদ বিলের মাধ্যমে জেলা পরিষদকে সামরিকীকরণের প্রতিবাদ করেন এবং যে সংসদে গণবিরোধী বিল পাস হতে যাচ্ছে সে সংসদ বয়কট করার আহবান জানান। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ জেলা পরিষদ বিলের প্রতিবাদে ১২ জুলাই ১৯৮৭ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বয়কট করেন।[৫১] বিল পাসের দিন জামায়াতসহ অন্যান্য বিরোধী জোট ও দল সকাল সন্ধে হরতাল আহবান করে। জামায়াতে ইসলামী জেলা পরিষদ বিলকে বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরণ হিসেবে আখ্যায়িত এবং এর তীব্র সমালোচনা করে। এ বিলের প্রতিবাদ এবং সরকারের পদত্যাগের সংগ্রাম অব্যহত রাখার ব্যাপারে জামায়াত দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল এবং জামায়াত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। সরকার এ কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। অবরোধের দিন বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দলের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন চালানো হয়। শত ষড়যন্ত্র বা নির্যাতনের পরও ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী সফল হয়। সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে অন্তরীণ করে রাখেন। অনেক বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি নির্যাতন, গ্রেফতার এবং হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১১ তারিখ থেকে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। অবরোধের পর ২/১ দিন ব্যতীত প্রায় পুরো নভেম্বারই অতিবাহিত হয় হরতাল অবরোধের মাধ্যমে। আন্দোলনের এ পর্যায়ে সংসদ ছেড়ে আন্দোলনের মাঠে নামার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে সকল বিরোধী দলীয় সদস্যের প্রতি আহবান জানানো হয়।

এ সময় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট্ এ এক সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদ ত্যাগের পক্ষে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, জামায়াত সংসদ সদস্যরা পদত্যাগে প্রস্তুত। আপনারা এগিয়ে আসুন। সংসদ ছেড়ে যৌথভাবে এ সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামুন।[৫২] ১৪৪ ধারা জারি, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, ২৭ নভেম্বার দেশে জরুরি অবস্থা জারি, বহু অমূল্য জীবন নাশ, নির্যাতনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ রাজনৈতিক নেতা-সংসদ সদস্য ও নিরীহ লোককে অন্যায়ভাবে আটক, মৌলিক অধিকার খর্ব, সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এবং এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে জনগণের আন্দোলনের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে জামায়াত সদস্যগণ জাতীয় সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ৩রা ডিসেম্বর '৮৭ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জামায়াতের ১০ জন সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৫৩] ঘোষণা মোতাবেক জামায়াতের ১০ জন সদস্য ৪ঠা ডিসেম্বর স্পীকারের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন কিন্তু স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী তা গ্রহণ করেননি। তিনি জানান,

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ চলাকালে স্পীকারের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করা যায়। অন্য সময় সংসদ সচিবের নিকট দিতে হবে। পরবর্তীতে ৫ই ডিসেম্বর জামায়াত দলীয় ১০ জন সংসদ সদস্য সংসদ সচিবের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।[৫৪] বাংলাদেশের ইতিহাসে দলীয়ভাবে সংসদ সদস্যদের সম্মিলিত পদত্যাগ এই প্রথম। সংসদ থেকে জামায়াতের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিনন্দিত হয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামীর এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উৎসাহিত এবং তীব্র করেছে। জামায়াতের কট্টর বিরোধী অনেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমেও জামায়াতের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান। এমন কি ভারত থেকে কাদের সিদ্দিকীও পত্র মারফত জামায়াতের এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান।[৫৫] উল্লেখ্য, জামায়াত এর সদস্যগণকে তৃতীয় জাতীয় সংসদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন ঘোষণা দিয়েছিল, সংসদ সদস্যগণ সংসদে গিয়ে অগণতান্ত্রিক সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকবেন এবং প্রয়োজনে জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংসদগণ সদস্যপদ ত্যাগ করবেন। জামায়াত সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার ২ দিনের মধ্যে এরশাদ সরকার তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

বিরোধী দলের সাথে জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনঃ

লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারির এক বছরের মাথায় সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে বিরোধী দলগুলো সামরিক সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ

অন্যান্য জোট ও দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানায়। জামায়াত জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের আলোকে যুগপৎ আন্দোলন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাপ্টিন্ (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরী, কাজী জাফর আহমদসহ আরো কয়েকজন নেতার উদ্যোগে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হলে তাঁরা জামায়াতকেও জোটে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চালান।[৫৬] কিন্তু জামায়াত নিজ অবস্থান থেকে বিরোধী জোটগুলোর সাথে যুগপৎ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে এপ্রিলে ১৫দল, ৭দল এবং জামায়াতের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার পর বিরোধী জোট ও দলগুলো সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী জোট ও জামায়াত ২৭ সেপ্টেম্বর '৮৪ দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে। সরকার হরতালে বাধা প্রদান করে। হরতালের দিন আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজ উদ্দিন নিহত হন এবং বিরোধীদলের অনেক নেতা কর্মী আহত হন। সরকারের সন্ত্রাস, গ্রেফতার এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের পাশাপাশি জামায়াতও ৩রা অক্টোবর প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ঐদিন ফুলবাড়িয়ায় জামায়াতের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, কেয়ারটেকার সরকার গঠন এবং এর অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়।[৫৭] সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত জোট ও দলগুলো ঢাকায় জাতীয় সমাবেশের ডাক দেয়। ১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ১৫ দল, ৭ দলের সাথে জামায়াতের উদ্যোগেও ঢাকায় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। জাতীয় সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে দাবি জানান। তিনি বলেন, জামায়াত সব সময় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে।[৫৮] সমাবেশে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জামায়াত কর্মী সমর্থকগণ

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। সমাবেশে ব্যাপক উপস্থিতি ঘটে। জামায়াতের সমাবেশের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে দেশের প্রথম সারির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়," মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গণসমাবেশ। সকাল ১১টা থেকে এ সমাবেশে যোগদানের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জামায়াতের কর্মী ও সমর্থকগণ মিছিল সহকারে আসতে শুরু করে। ১৪ অক্টোবর মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান রাস্তার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত গণসমাবেশের বিস্তৃতি ঘটেছিল।[৫৯]"

ঢাকায় যুগপৎভাবে অনুষ্ঠিত ৩টি মহাসমাবেশের পর আন্দোলন নতুনভাবে গতিসঞ্চার করলে সরকার ২০শে ডিসেম্বর দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সরকার ১৯৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল সংসদ নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ অন্যান্য বিরোধীদল ও জোট এ নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দেয়। ১৯৮৫ সালে স্থগিত উপজিলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ অন্যান্য দল এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। সরকার বিরোধীদলের ওপর জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে বিরোধীদল বিহীন উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করে নেয়। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিরোধীদলের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সরকার '৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। '৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে সরকারের ব্যালট ডাকাতি ও নজিরবিহীন সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপটে প্রধান বিরোধীদলগুলো নির্বাচন বর্জনের আহবান জানায়। নির্বাচনের দিন ৮ দল, ৭ দলের পাশাপাশি জামায়াতও হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে। হরতালের কারনে ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি ছিল খুব কম। তারপরও জেনারেল এরশাদের পক্ষে বিপুল ভোট দেখিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল দল ও জোটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বর্জনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১০ নভেম্বর ঘোষণা করা হয় ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী। অবরোধ কর্মসূচীর পূর্বে বিরোধী দলের খবর প্রচারের দাবিতে দুই জোটের পাশাপাশি জামায়াতের সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। মৌচাকে সমাবেশের পর জামায়াত ঢাকার রামপুরাস্থ টি.ভি কেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৬০] ১০ নভেম্বর রাজধানী ঢাকা অবরোধের এ কর্মসূচী সারা দেশের জনগণের মধ্য ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের সর্বত্র 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর প্রস্তুতি চলতে থাকে। এরশাদ সরকার এতে দিশেহারা হয়ে ৮ নভেম্বর ঢাকা মহানগরীতে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ঢাকার সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।[৬১] সরকারের সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, গ্রেফতার, সন্ত্রাস, ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করেই জামায়াত ও অন্যান্য জোট ও দল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। এ দিনের অবরোধ কর্মসূচী পালন কালে কমপক্ষে ৪ জন বিরোধী দলীয় কর্মী নিহত হয় এবং আহত হয় ১০০ জন। এ দিন সমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কেয়ার টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে বিনা রক্তপাতে পদত্যাগ করার জন্য এরশাদের প্রতি আহবান জানান। সকাল ১০ টায় ফুলবাড়িয়া এবং বাদ জোহর বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ করে জামায়াত। জামায়াতের মিছিল গুলিস্তান এলাকার কাছে পৌঁছালে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং বহু জামায়াত কর্মী আহত হয়।[৬২] ১০ নভেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে হত্যা সন্ত্রাস গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ১১ ও ১২ নভেম্বর হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১০ নভেম্বর ও এর পরবর্তী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে ১৩ নভেম্বর বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ পাশে সর্বদলীয় গায়েবানা জানাজা ও উত্তর পাশে জামায়াতের দোয়া সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা ও দোয়া সমাবেশ শেষে জামায়াত ও অন্যান্য জোট ও দল

২টি পৃথক মিছিল বের করে। ৮ দল, ৭ দল, ৫দল, ৬দল ও জামায়াতসহ আন্দোলনরত বিরোধী জোট ও দলগুলো ১৪ নভেম্বার এবং ১৫ নভেম্বার হরতাল উত্তর এক সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ১৬ এবং ১৭ নভেম্বার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে।[৬৩] ১৫ নভেম্বার সারাদেশে অর্ধদিবস এবং শিল্পাঞ্চলে ৪৮ ঘন্টা হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[৬৪] ১৭ নভেম্বার হরতাল শেষে অন্যান্য জোট ও দলের সাথে জামায়াত ২১ ও ২২শে নভেম্বার সারাদেশে বিরামহীন ৪৮ ঘন্টার হরতাল আহবান করে। এ সময় জামায়াত কর্মপরিষরের এক জরুরি বৈঠকে খালেদা-হাসিনাসহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তদাবি এবং কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণের আহবান জানানো হয়।[৬৫] আন্দোলনের এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা দল সরকারের সাথে গোপনে আপস এবং আলোচনার চেষ্টা চালান। জামায়াতের পক্ষ থেকে এ ধরনের গোপন আপস আলোচনার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়, এ আলোচনায় ব্যক্তিস্বার্থ বা দলগত কিছু সুবিধা আদায় হতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে না। জামায়াতের তৎকালীন সহকারী মহাসচিব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ প্রেক্ষাপটে দৃঢ় ঘোষণা উচ্চারণ করে বলেন, জনগণের দাবির প্রশ্নে জামায়াত আপস করবেনা।[৬৬] অন্যান্য জোট ও দলের সাথে জামায়াতের পক্ষ থেকেও ২৯ শে নভেম্বার থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল আহবান করা হয়।[৬৭] জামায়াতসহ বিরোধী জোট ও দলের লাগাতার হরতাল কর্মসূচীতে সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সকল সংসদ সদস্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে পদত্যাগের আহবান জানানো হয়। জামায়াত সদস্যগণ ৩রা ডিসেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সরকার ৫ ই ডিসেম্বর রাতে বিভাগীয় শহরগুলোতে কারফিউ জারি করে এবং তা কয়েকদিন বলবৎ থাকে। ৬ ডিসেম্বর রাতে সরকার জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং একই সাথে ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

Dhaka University Institutional Repository

তারিখে ঘোষিত হয়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বারে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার পর ব্যর্থ হয়ে যায়। আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক গবেষক মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম ৪টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন।[৬৮] (১) এরশাদের মূল সমর্থক সামরিক বাহিনী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় এরশাদের পক্ষে ছিল। (২) আন্দোলনে গণমানুষের অংশ গ্রহণ কম ছিল। মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী দ্বারাই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। (৩) কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রধান ২টি জোট আন্দোলনকে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এজন্য আন্দোলন সুসংগঠিত ছিল না। (৪) আন্দোলনের প্রধান দুই নেত্রী খালেদা ও হাসিনা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন। দু'নেত্রীর মধ্যকার অবিশ্বাস আন্দোলনের তীব্রতাকে অনেকাংশে হ্রাস করতে সহায়তা করেছে। এরশাদ সরকারের অধীনে নির্বাচনের অংশ গ্রহণের নিষ্ফলতা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতসহ সকল প্রধান রাজনৈতিক দল চতুর্থ জাতীয় সংসদ নিবাচন বর্জন করে। কিন্তু এরশাদ বিরোধী দলের বয়কট সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, একটি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা এবং সফলতা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করে না বরং জনগণের অংশ গ্রহণ এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে।[৬৯] বিরোধীদলহীন সংসদ নির্বাচন এরশাদের বৈধতার সংকটকে আরো প্রকট করে তোলে। বিরোধীদলের আন্দোলনও অব্যহত থাকে। ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এমন মাস খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে যে মাসে অন্ততঃ দেশব্যাপী একদিন হরতাল পালিত হয়নি।[৭০] নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকট বৈধতার সংকট কাটাতে ব্যর্থ হয়ে এরশাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ১লা জুন সরকার সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল উত্থাপন করেন। এ বিলে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয়। ৭ জুন ২৫৪ ভোটে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল তথা রাষ্ট্র ধর্ম বিল পাস করা হয়। সংবিধানের

অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে ৭দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "রাষ্ট্রপতি নিজেই অবৈধ, সংবিধান কোন সংশোধনী আনার তাঁর কোন অধিকার নেই।" তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা জনগণের কোন দাবি নয় এবং এটি দেশে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করতে পারবে না।[৭১] ৮দলীয় জোট নেত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ সম্পর্কে বলেন, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে এ বিল আনা হয়েছে। এরশাদ সরকারের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, যেহেতু এ সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয় তাই এ সরকারের ক্ষমতায় থাকা বা কোন বিল আনা বা সংবিধান পরিবর্তন করার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনা যেহেতু সংসদ সদস্যগন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন।[৭২] রাষ্ট্রধর্ম বিল সম্পর্কে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ নয় বরং জনগণকে বিভ্রান্ত এবং তাদের ইসলামী আন্দোলন থেকে বিমুখ করার লক্ষ্যে এটি ঘোষণা করা হয়েছে।[৭৩] অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর ৮দল, ৭দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ১২ জুন হরতাল আহবান করা হয়। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে ঢাকায় এক প্রতিবাদ সমাবেশে শেখ হাসিনা ৮ম সংশোধনী সম্পর্কে বলেন, তাঁর দল কখনও সুযোগ পেলে তা বাতিল করবে। তিনি অভিযোগ করেন, ৮ম সংশোধনী স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার এবং বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।[৭৪] বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ৮ম সংশোধনী গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জাতিকে বিভক্ত এবং দেশে সাম্প্রদায়িক উসকানি সৃষ্টির জন্য ধর্মকে অপব্যবহার করার একটি উদ্যোগ।[৭৫] বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ সিরাত মিশন, মুজাহিদুল ইসলাম পার্টিসহ[৭৬] আরো কয়েকটি ছোট ছোট ইসলামী দল

সংবিধানের ৮ম সংশোধনী তথা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণায় সরকারকে অভিনন্দন জানালেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একে ইসলামকে সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইসলামী দলগুলোর আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকারের ধূর্ত এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে। জামায়াত এটিকে সরকারের পক্ষে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রতারিত করার পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে।[৭৭]

অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৭৮] এরশাদ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ৬ জুন '৮৮ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, রাষ্টধর্ম আইন দেশে ইসলামী মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আসার পথ বন্ধ করার জন্য করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ একটি 'খোমেনী রাষ্ট্র' হতে না পারে।[৭৯] প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জীবনাচার এবং মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়নি বরং তাঁর সরকারের বৈধতার সংকট কাটানোর লক্ষ্যে ইসলামপ্রিয় জনগণের সমর্থন পাওয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল পাস করা হয়েছে। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়নি বা ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনাও সরকারের ছিলনা। বরং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে।[৮০]

১৯৮৮ সালের শেষ দিকে যুগপৎ আন্দোলনে ছেদ পড়ে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ৮ দলীয় জোট বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলো জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে

আন্দোলন শুরু করে। দলগুলো স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আহবান জানায়।[৮১] ৫ দলের পক্ষ থেকে জামায়াত শিবির চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়।[৮২] জামায়াত সরকার ও এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকে উসকানি দেয়ার অভিযোগ তোলে। জামায়াত তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সন্ত্রাসকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার কথা ঘোষণা দেয়। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এক প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শেখ হাসিনাসহ কতিপয় নেতা ও দল জামায়াত ও শিবিরকে নির্মূল করার যে আহবান জানিয়েছেন তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে।[৮৩] জামায়াতের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন এবং সন্ত্রাসে সরকারের ইন্ধন ছিল বলে জামায়াতের বিশ্বাস। জামায়াতের মতে, দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের কারণে তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হয়েছে বলে এরশাদ জামায়াতের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে মেতে ওঠেন এবং একটি জোটকে বাগে এনে জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন।[৮৪] ১৯৮৮ ও '৮৯ সালে সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন কোন ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিভিন্ন জোট ও দলের মধ্যে অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে জামায়াত ও অন্যান্য বিরোধীদল ও জোট পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আবার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়।[৮৫] ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাস থেকে আন্দোলন আবার তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বিরোধী জোট ও দলগুলোর মধ্যে ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে তিন জোট ও জামায়াতের পক্ষ থেকে ১০ অক্টোবর ঢাকা সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ১০ অক্টোবরের কর্মসূচী দীর্ঘ দিন পর গণতন্ত্রমনা মানষের মনে আশার সঞ্চার করে। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দও এ কর্মসূচীকে দীর্ঘদিন পর বিরোধী দলের আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্রী পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রবীণ বাম নেতা পীর হাবিবুর রহমান বলেন, "আগামী ১০ অক্টোবরের

কর্মসূচী দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর একটি সমন্বিত প্রোগ্রাম। এ কর্মসূচী বিরোধী দলের রাজনীতির জন্য একটি শুভ লক্ষণ। সামগ্রিক দিক থেকে ১০ অক্টোবর একটি ঐক্যমুখী আন্দোলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।" জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আগামী ১০ অক্টোবরের কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠবে বলে আমি মনে করি।[৮৬] সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠান করে। জামায়াতে ইসলামী দৈনিক বাংলার মোড়ে সমাবেশ করে। কাকরাইলেও অনুরূপ সমাবেশের আয়োজন করে। দুটো সমাবেশেই তারা পুলিশের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। কর্মসূচী পালনকালে হত্যা, সন্ত্রাস, গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে জামায়াত অন্যান্য জোট ও দলের সাথে ১১ অক্টোবর হরতাল কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়। ১০ অক্টোবর ঘেরাও কর্মসূচী পালন কালে পুলিশ বাহিনী এবং সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রসহ ৫ জন নিহত হয়। অসংখ্য বিরোধীদলীয় কর্মী আহত ও গ্রেফতার হয়। ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অনেক বিরোধী দলীয় নেতাও আহত হন। সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে পুলিশ ও সরকারের সমর্থকদের গুলিতে ৫ ব্যক্তি নিহত ও শতশত ব্যক্তির আহত হওয়া এবং পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর হরতাল পালন ছাড়াও জামায়াত অন্যান্য জোট ও দলের সাথে যুগপৎ দেশব্যাপী ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস ও ১০ নভেম্বার পূর্ণদিবস হরতালসহ অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৮৭] পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আহবানে ১৬ অক্টোবর হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালন শেষে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট্ এ ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত সমাবেশে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, এখন প্রয়োজন গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ, যার লক্ষ্য হবে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে কেয়ার-টেকার সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে পার্লামেন্ট্ নির্বাচন।[৮৮] এর আগে ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর পুলিশের গুলিতে ঢাকা পলিটেকনিকের একজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ অক্টোবর অন্যান্য জোট ও দলের সাথে জামায়াতও ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। হরতাল কর্মসূচী শেষে জামায়াত বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট্ এ এক সমাবেশের আয়োজন করে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ৫ নভেম্বার ছিল বিরোধীদল ও জোটগুলোর বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র ঘেরাও কর্মসূচী। ৮, ৭ ও ৫ দলের পাশাপাশি জামায়াতও সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। ৬ নভেম্বার ৮,৭,৬ দলীয় জোট এবং জামায়াত সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে। জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ মগবাজার চৌরাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে দলের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনতার দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।[৮৯] ৮দল, ৭ দল, ৬ দল, ৫দল, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের আহবানে ১০ নভেম্বার সারাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সকাল-সন্ধে হরতাল পালিত হয়। হরতাল কর্মসূচী শেষে জোট ও দলগুলো সরকারের পদত্যাগ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে ২০ ও ২১ শে নভেম্বার ৪৮ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। ৪৮ ঘন্টা হরতাল ছাড়াও আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন জোট ও দলের সাথে যুগপৎ জামায়াত ১১থেকে ১৯ নভেম্বার সভা সমাবেশ, বিক্ষোভ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৯০]

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব ঃ জামায়াতের কর্মসূচী

১০ নভেম্বার হরতাল শেষে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট্ এ অনুষ্ঠিত জামায়াতের সমাবেশে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান গোটা জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রতি আহবান জানান।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল শেষে ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক জামায়াত দেশব্যাপী সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সারা দেশ সফর এবং সভা সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানে জামায়াত এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে জনসভার আয়োজন করে। ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনসভায় বিরোধীদলের ঐক্যকে সংহত করার আহবান জানিয়ে বলেন, স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। অন্যথায় '৮৭, '৮৮, '৮৯ সালের মত সরকারি মহল বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ছাত্র জনতার ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা ওঠাতে সক্ষম হবে।[৯২] ১৯ নভেম্বর '৯০ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন ৩ জোট ও জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা পেশ করা হয়। ৮ দল, ৭ দল , ৫ দল যৌথভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলায় স্বাক্ষর করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা পেশ এবং যৌথ ঘোষণাকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদিন বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট্ এ জামায়াত আয়োজিত সমাবেশে জামায়াতের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কেয়ার-টেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন। জনাব খান সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেয়ার-টেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে বলেছেন, "সরকার যদি আমাদের আহবানে সাড়া দিতে সক্ষম হন তাহলে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ ঘটনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে"। জামায়াতের কেয়ার-টেকার সরকারের রূপরেখা[৯৩] নিম্নরূপ ছিলঃ

১। সংবিধানের ৭২ (১) ধারায় ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট বর্তমান জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করবেন এবং সংবিধানের ৫৮(৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবেন।

২। সংবিধানের ৫১ (ক) (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৫ (ক) (১) ধারা অনুযায়ী একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন যিনি আন্দোলনের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হবেন।

৪। সংবিধানের ৫১ (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

৫। ৫১(৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের সাথে সাথে সংবিধানের ৫৫ (১) ধারা অনুযায়ী নবনিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

৬। ৫৮ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত দলগুলোর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি কেয়ার-টেকার সরকার গঠন করবেন।

৭। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং কেয়ার-টেকার সরকারের সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

৮। সংবিধানের ১১৮ (১) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

৯। সংবিধানের ১২৩ (৩) খ অনুযায়ী সংসদ বাতিল হবার দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০। নবনির্বাচিত সংসদই দেশের ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতির অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকবে, না সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে তা নির্ধারণ করবে।

যৌথভাবে তিনজোট এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা ঘোষণা করার পর সরকার বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। ২০ নভেম্বর সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সাধারণ জনগণ বিরোধীদলের আন্দোলনে একাত্মতা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করে। সকল মহলের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের। ২১শে নভেম্বার ঢাকায় এক সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান অবিলম্বে কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে বলেন, কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এখন জাতীয় দাবি।[৯৪] সরকার আন্দোলনকারী বিরোধীদলীয় কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন এবং দমনের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাহিনী লেলিয়ে দেয়। এরশাদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। ২৭ নভেম্বার '৯০ এরশাদের লেলিয়ে দেয়া চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিহত হন বি.এম.এ নেতা ডাঃ শামসুল আলম মিলন। ডাঃ মিলনের হত্যাকাণ্ডের খবর সারাদেশে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ৭দল, ৮দল, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও জোটের তীব্র আন্দোলন থেকে আত্মরক্ষার সর্বশেষ কৌশল হিসেবে ২৭ নভেম্বার প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে সংবিধানের ১৪১(ক) ধারা বলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২৭ শে নভেম্বার রাতে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের খোঁজে বাসায় বাসায় তল্লাশি চালানো হয়। জামায়াতের নায়েবে আমীর আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ গ্রেফতার হন। গ্রেফতার, নির্যাতন ও গুলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এরশাদ সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং জনগণের পক্ষ থেকেও জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ ২৭ নভেম্বার থেকে সকল পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন। জনগণ জরুরি আইন ও কারফিউ ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে চলতে থাকে মিছিলের পর মিছিল। এরশাদের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর গুলিতে ৩ জন জামায়াত কর্মীসহ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও নিরীহ লোক নিহত হয়।[৯৫] বিএমএ নেতা ডাঃ মিলনের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করার জন্য ৭, ৮,৫ দল জামায়াতকে অনুরোধ করে।[৯৬] জামায়াত এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে।

৩০ ডিসেম্বর বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নিহতদের উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাযা। জানাযার শেষে কারফিউ ভঙ্গ করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। এ মিছিলে বিপুলসংখ্যক জামায়াত কর্মী অংশ নেন। জামায়াতের সেক্রিটারি জেনারাল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং ঢাকা মহানগরী আমীর আবদুল কাদের মোল্লা অন্যান্য জোট ও দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মিছিলের নেতৃত্ব দান করেন।[৯৭] আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৩রা ডিসেম্বর রাতে নতুন কৌশলে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে মনোনয়নের ১৫ দিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। জামায়াত ও অন্যান্য সকল দল ও জোট তাঁর এ ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা প্রত্যাখান করে। ফলে ৪ঠা ডিসেম্বর রাতেই জেনারাল্ এরশাদ স্বীয় পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ৫ই ডিসেম্বর তিনজোট ও জামায়াতে ইসলামী প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদকে কেয়ার-টেকার সরকার প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দানের কথা ঘোষণা করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান কেয়ার-টেকার সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদের নাম ঘোষণা করেন।[৯৮] এদিন সন্ধের পর জামায়াত নেতৃবৃন্দ মাওঃ আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের (নায়েবে আমীর) নেতৃত্বে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাসভবনে যান। প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক অবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পর ৫ নভেম্বার জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, ৭দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৫দলীয় জোট নেতা রাশেদ খান মেনন জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও এবং টেলিভিশনে ভাষণ দেন। আব্বাস আলী খান

তাঁর ভাষণে "স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জনগণের এ বিজয়কে অর্থবহ করে দেশে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে হলে যে কোন মূল্যে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে।" অবশেষ বিরোধী জোট ও দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদের কেয়ার-টেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরশাদ সরকারের পতনের পর ৭ ডিসেম্বর জামায়াত দেশব্যাপী শোকরানা দিবস পালন করে। ঢাকায় শোকরানা সমাবেশে জামায়াত প্রধান আব্বাস আলী খান বলেন, আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ধৈর্য, সহনশীলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা ও পরমত সহিষ্ণুতা ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি দেশবাসীকে আহবান জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা একে অপরকে ভালবাসতে শিখি, অতীতের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলি। তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপরই দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।"[৯৯] ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল ৯ ডিসেম্বর দুপুরে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। স্বৈরশাসনের পতনের পর জাতির আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।[১০০]

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীদের ভূমিকা ঃ

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ের নেতা কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসুচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জামায়াত নেতা কর্মীদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের অনেক নেতা কর্মী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শত শত জামায়াত কর্মী। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ জামায়াতের অনেক নেতা কর্মী কারাবরণ করেছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে (১৯৮২-৯০) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর যে সব নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন তাদের বিবরণ নিন্মোর তালিকা থেকে তা জানা যায়।"[১০১]

নিহত নেতা-কর্মীদের নাম	ঠিকানা	নিহত হওয়ার তারিখ
১। সোহেল পারভেজ	গুংগাদিয়া বাজার, উপজেলা-বিয়ানী বাজার, সিলেট	২৩ মে, ১৯৮৬ (আহত ১০মে, ৮৬)
২।শাহবাজ উদ্দিন	সিরাজগঞ্জ, জেলা সদর ।	২৮ সেপ্টেম্বর '৮৮
৩। মফিজুল ইসলাম	সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। (নিহত কুমিরা, চট্টগ্রাম।)	৮অক্টোবর '৮৮
৪। আতাউর রহমান	রপুর জেলা সদর।	১২ নভেম্বার '৮৮
৫। আবু তাহের	চট্টগ্রাম মহানগরী	৪ মে, ১৯৮৯
৬। মোঃ ফরহাদ	খুলনা মহানগরী	২৩ জুলাই ১৯৮৭
৭। আকবর আলী	খুলনা মহানগরী	৩০ নভেম্বর ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৮৫ সালের ১৭ এপ্রিল সকাল ১১টায় উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার জন্য জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছালে পুলিশ চারজন জামায়াত কর্মী ও ড্রাইভারসহ তাঁকে গ্রেফতার করে।

১৯৮৫ সালের ২২শে এপ্রিল বাদ আসর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট থেকে ১৪৪ ধারা ও সামরিক আইনের বিধি ভঙ্গ করে উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবে যাওয়ার পথে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট নজরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রিট্যারি আবদুল কাদের মোল্লা, ঢাকা জেলা জামায়াতের সেক্রিট্যারি নাজিম উদ্দিনসহ ৪২ জন নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় চার মাস কারাভোগের পর তাঁরা ১৯৮৫ সালের ১৫ অগাস্ট মুক্তি লাভ করেন।[১০২] এ ছাড়া এ সময়ে কুষ্টিয়ার জেলা আমীর ডাঃ আনিসুর রহমান ও ফরিদপুর জেলা আমীর অধ্যাপক শাহেদ আলীকেও গ্রেফতার করা হয়। মাগুরায় জামায়াত নেতা শামশুল আলম ও ইসলামী ছাত্রশিবির নেতা এরশাদ উল্যা অহিদকে উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে মিছিল করার জন্য সামরিক আদালতে ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[১০৩] ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বার ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর সময় এরশাদ সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীরের ওপর চরম নির্যাতন চালায়, গ্রেফতার করা হয় অনেক নেতা কর্মীকে। ২৫ অক্টোবর '৮৭ মধ্যরাতে জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর আলী আহসান মুজাহিদকে (বর্তমান সহকারী মহাসচিব) ঢাকায় তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুস সোবহান, পাবনা, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ, এডভোকেট আবদুল কাদের, নারায়নগঞ্জ, মাওলানা শামসুদ্দিন- চট্টগ্রাম, মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী,

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, চট্টগ্রাম, মুফতি মাওলানা আবদুস সাত্তার, খুলনা, ডাঃ আবুল হোসাইন, নড়াইল, মাওলানা আবদুল বারী, লালমনিরহাট, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের,মেহেরপুর, মুঃ শহীদুল্লাহ, রাঙ্গামাটি প্রমুখ নেতাসহ প্রায় ৩৭ জন নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে। অতঃপর ২৬ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বারের মধ্যে সারদেশে বেশ কয়েকজন জেলা ও উপজেলা আমীরসহ দু'শতের অধিক নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয়[১০৪]। এরশাদের পতন আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন ২৭ নভেম্বার, ১৯৯০ রাতে জামায়াতের নায়েবে আমীর আবুল কালাম মুঃ ইউসুফকে তাঁর ঢাকার বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বারে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর প্রস্তুতি ও তা বাস্তবায়নকালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার ১৭ জন সদস্য ও আড়াই'শ কর্মীকে আটক করে।[১০৫]

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিকা ঃ

১৫ দল ও ৭দলীয় জোটের অনুগামী ছাত্র সংগঠন এবং জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও (ই ছা শি) এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। ই ছা শি ছাত্র সমাবেশ, মিছিল, গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে ছাত্র জনতাকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। এরশাদের পতন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ই ছা শি জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে একাধিক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। এরশাদের পতনের লক্ষ্যে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠিত হলে ছাত্রশিবির সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে যুগপৎভাবে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ই ছা শি ১০ই নভেম্বার '৯০ হরতাল শেষে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের সমারেশ থেকে অবিলম্বে কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরপূর্বক এরশাদ সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীগুলো হচেছ-[১০৬]

১১ ই নভেম্বার - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাসে যোগদান।

১২ই নভেম্বার - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, সরকার কর্তৃক সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টা ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল।

১৩ই নভেম্বর - দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমন্বিত ও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ছাত্র- শিক্ষক-পেশাজীবী সমাবেশ।

১৫ই নভেম্বার - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ সহ যাবতীয় কালাকানুন বাতিলের দাবিতে জেলা পরিষদ কার্যালয় ঘেরাও।

১৬ই নভেম্বার - ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সমাবেশ।

১৭ই নভেম্বার- স্বৈরাচার ও তার দোসর, দালালদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ দিবস।

১৮ই নভেম্বার - ছাত্র-শ্রমিক-সংহতি দিবস পালন।

১৯ই নভেম্বার - স্বৈরাচার পতনের আহবান জানিয়ে হরতালের সমর্থনে দেশব্যাপী মিছিল-সমাবেশ।

২০ ও ২১শে নভেম্বর- বিভিন্ন জোট ও দলের আহুত সর্বাত্মক হরতাল পালন।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ এবং সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১০ জন কর্মী নিহত হয়। এ সময় আওয়ামী লীগসহ বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের হাতে নিহত হয় আরো ২৫ জন শিবির কর্মী।[১০৭]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ঃ জামায়াতের লাভ-ক্ষতিঃ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকার কারণে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জিয়াউর রহমানের সময়ে ১৯৭৮ সালে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

Dhaka University Institutional Repository

করা হলে জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৯ সালের মে মাসে নতুন আঙ্গিকে স্বনামে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের তিন বছরের মধ্যে সামরিক শাসন জারির কারনে জামায়াত নিয়মিত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে বাধার সম্মুখীন হয়। পুনরায় আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা রেস্তোরাঁয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ৫ দফার 'পলিটিক্যাল সিস্টেম্' ঘোষণা করেন।[১০৮] অতঃপর ১৯৮১ সালে জামায়াতে ইসলামী ৭ দফা গণদাবি পেশ করে এবং এর ভিত্তিতে জামায়াত আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ৭ দফার আন্দোলন নিয়ে বেশি দূর এগুবার আগেই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ দেশের ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক শাসন জারির কিছুদিন পরই জামায়াত এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট (পরবর্তীতে ৮দল) এবং বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের সাথে যুগপৎভাবে জামায়াত এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। জামায়াত আল্লাহর আইন এবং সৎলোকের শাসন কায়েমের পথে সামরিক শাসনকে বাধা হিসেবে বিবেচনা করে। জামায়াতের মতে, "দেশকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না যতক্ষণ না জনগণকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা দেয়া হয়। জগণকে যদি সরকার নির্বাচনের ক্ষমতা না দেয় তাহলে তারা কীভাবে দেশ গঠনে সাহায্য করবে? এ জন্য জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহী এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সাথে সংগ্রাম অব্যহত রাখতে আগ্রহী"।[১০৯] দীর্ঘ প্রায় ৯বছর জামায়াত এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে অন্যান্য জোট ও দলের সাথে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এ আন্দোলনে জামায়াতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও এর সাংগঠনিক স্বাভাবিক কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কেননা

জামায়াত দাওয়াত এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং চরিত্র ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম-আলোচনা, সভা-সমাবেশ, ওয়ার্কশপ এবং সামাজিক তৎপরতার মত শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ইসলামী সচেতনতা সৃষ্টি জামায়াতের অন্যতম কর্মসূচী।[১১০] কিন্তু সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারনে জামায়াতের গঠনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণে জামায়াতের ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হয়েছে বলে জামায়াত নেতৃবৃন্দ মনে করেন। জামায়াত নেতার[১১১] মতে, ৬০ এর দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ফলে জামায়াতের গণভিত্তি রচিত হয়েছে। দীর্ঘ ৯ বছর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াত একটি স্বীকৃত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, ১৯৯১ সালে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র তীব্র মেরুকরনের মধ্যে জামায়াতের ১৮টি আসন লাভ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফসল।

জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথে ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্যেই জামায়াত সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। জামায়াত সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৭১ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত, নেজামে ইসলাম ও খেলাফত রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ইসলামিক ডেমক্র্যাটিক লীগ (আইডিএল) মুসলিম লীগের সংগে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জোট ২০টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে জামায়াতের আসন ছিল ৬।[১১২] এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৬ সালে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের (বিএনপি ব্যতীত) সাথে জামায়াত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রথম অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জামায়াত ৭৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ব্যাপক সন্ত্রাস, ব্যালট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত ১০টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ১৫টি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াত আইনগত মর্যাদা লাভ করে।[১১৩] ১৯৮৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠলে জামায়াত সংসদ সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। জামায়াতসহ অন্যান্য জোট ও দলের আন্দোলনের ফলে এরশাদের পতনের পর নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত প্রথম বারের ২১৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা এবং সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনী পরিবেশ বিরাজ করায় জামায়াত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নিকট 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম' এর লক্ষ্যে এর কর্মসূচী পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। ৫ম সংসদ নির্বাচনে জামায়াত প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১২.১৩ ভাগ পেয়ে ১৮টি আসন লাভ করে। প্রায় অর্ধশত আসনে জামায়াত প্রার্থী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

নিন্মোর সারণি থেকে নির্বাচনে জামায়াতের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন এবং সফলতার চিত্র পাওয়া যায় ঃ[১১৪]

বছর	কত আসনেপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট ভোট
১৯৭৯	৬২	৬	৭,৫০,০০০
১৯৮৬	৭৫	১০	১৩,১৪,০৫৭
১৯৯১	২১৮	১৮	৪১,২৪,৮৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচনে জামায়াত অংশ গ্রহণ করেছে তম্মধ্যে এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ৫ম সংসদ নির্বাচনে জামায়াত সবচেয়ে বেশি আসন এবং শতকরা হিসেবে বেশি ভোট অর্জন করেছিল। ৯১'র সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতের সাফল্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায়, ৮০ দশকে এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আপসহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার জন্যে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় জামায়াতের ব্যাপক গণভিত্তি রচিত হয়েছে।[১১৫] যদিও বরাবরই জামায়াতে ইসলামী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। তারপরও কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জামায়াতের আন্দোলনকে ভিন্ন চোখে মূল্যয়ন করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত রাজনৈতিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হচ্ছে।[১১৬] এ প্রসঙ্গে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকাকে খাটো করার জন্য এটি একটি প্রপ্যাগ্যান্ড্যা। জামায়াত এর আদর্শিক কারনে সামরিক শাসনের রিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। জামায়াত সামরিক একনায়কত্বকে ইসলাম এবং জাতির জন্য ক্ষতিকর মনে করে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক শাসনের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরোক্ষ মদদ আছে বলে তিনি মনে করেন।[১১৭] সামরিক শাসন ও একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করলে এবং নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হলে জামায়াতের কর্মসূচী বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হবে।[১১৮] গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াতের সাফল্যে দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী শক্তি অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তারা জামায়াতের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। এক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) ও গণমাধ্যম জামায়াত এবং ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম হাতে নেয়।[১১৯] কারণ, কিছু কিছু

Dhaka University Institutional Repository

এন.জি.ও'র মতে, জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধি পেলে মিশন্যারি কার্যক্রমসহ নারীদের ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার, এবং সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশ গ্রহণ কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কয়েকটি পত্রিকা আদর্শগত এবং কৌশলগত কারণে জামায়াতের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। তারা জামায়াতের ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে থাকে। জামায়াতের উথানকে তারা সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতির প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে।

তথ্য সংকেত ও টীকা ঃ

১। গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, ১৯৮৭, ঢাকা-পৃঃ ৪-৬

২। Golam Azam, *A Guide to the Islamic Movement*. (Dhaka, Azam Publication, 1968) P. 62-6

৩। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, ১৯৯৮ পৃঃ-৭

৪। *গঠনতন্ত্র* , জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৯৫-পৃঃ ১৩-১৫

৫। David E. Sopher, উদ্ধৃত ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭) পৃঃ- ১৫

৬। John.L. Esposito "Introduction: Islam & Muslim Politics" in J.L Esposito, *Voices of Resurgent Islam* (Oxford University Press, 1983) p-5

৭। আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা-১৯৯৮ পৃঃ-৩

৮। Tajul Islam Hashmi, "Islam in Bangladesh Politics" in Hussain Mutalib, Tajul Islam Hashmi *Islam Muslims and the Modern State: Case Studies of Muslims in thirteen countries* St. Martin's Press, Newyork. 1994, p-104

"We may categorize the different groups of people championing the cause of Islam into four broad categories: a) The militant reformist (fundamentalist)

b) The fatalist c) the Anglo Mohamedan (opportunists and pragmatist) and d) the orthodox (including pirs and sufis, often escapist). The first two categories, which generally represent the Jamaat-I-Islami and the Tabligh Jammat respectively, are non-communal by nature."

৯। Tajul Islam Hashmi, *Ibid* p-121,

১০। Professor Ataur Rahman, "Democracy and Governance in Bangladesh" *বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা* ১৯৯৩ পৃঃ১৫৭

১১। ডঃ হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ ঃ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, একাডেমী পাবলিশার্স , ঢাকা-১৯৯৩ পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

১২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ নির্বাচনে জামায়াত ব্যতীত মুসলিম লীগসহ অন্যান্য ইসলামী দল মিলিতভাবে ভোট পেয়েছিল ৭.৮৫%। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত এককভাবে ১০টি আসন লাভ করে । ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১৮টি আসন এবং ১২.১৩% ভোট পায়। ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে জামায়াত তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পলিসির কারনে সর্বশেষ নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয় ঘটে। তবে অপর সকল ইসলামী দলের মিলিত ভোটের চেয়ে জামায়াত অনেক বেশি ভোট পায়। সূত্রঃ ডঃ হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব , সংগঠন ও আদর্শ,* প্রাগুক্ত - পৃঃ ৩১ ।

১৩। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৯৩,পৃঃ ৫৮।

১৪। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *বাম রাজনীতির ৬২ বছর*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২৩

১৫। ফাইজুস সালেহীন, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ২৩

১৬। U.A.B. Razia Akter Banu, “Jammat -E-Islami Bangladesh: Challenges & Prospects”. In Hussain Mutalib & Tajul Islam Hashmi. *প্রাগুক্ত*-পৃঃ ৪।

১৭। ডঃ হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*- পৃঃ-৯

১৮। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা* -পৃঃ-৩

১৯। *পুর্বোক্ত* - পৃঃ ৪

২০। দেখুন, ১৯৮৬ সালের ২৫-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত *রুকন সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণের পুস্তিকা*, পৃঃ-৭

২১। *Bulletin*, Jammat-e-Islami Bangladesh, Vol-1, November 1990, P-1.

২২। গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত* -১৯৯১, পৃঃ ১৮

২৩। মতিউর রহমান নিযামী, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৭

২৪। গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৬

২৫। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রিট্যারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

429724

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২৬। দেখুন, দেশব্যাপী দাবি দিবস উপলক্ষে ৭ এপ্রিল '৮৬ প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন *১৫ দলের প্রচারপত্র*।

২৭। *গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী*, প্রচার বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। ডিসেম্বর ১৯৮৪, ঢাকা,পৃঃ- ৯

২৮। দেখুন, সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সংলাপ, শীর্ষক জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত *প্রচারপত্র*, ২৬শে মার্চ ১৯৮৩

২৯। দেখুন, দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৯শে মার্চ ১৯৮৩ পৃ-১

৩০। দেখুন, পুস্তিকা-*গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা* - প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, পৃ- ৬-৭

৩১। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ঢাকা-২৮ অক্টোবর '৮৩

৩২। *পূর্বোক্ত*, ঢাকা- ২৯শে নভেম্বর '৮৩

৩৩। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রিট্যারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

৩৪। আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২২ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩৩

৩৫। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৮শে ডিসেম্বর '৮৪

৩৬। The *Bangladesh Observer*, 6th April 1984.

৩৭। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ-৯.

৩৮। মতিউর রহমান নিজামী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-৩০

৩৯। সূত্রঃ The Bangladesh *Observer*, Dhaka -18 April, 1984

৪০। সূত্রঃ *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*।

৪১। যে কোন প্রার্থীর একাধিক আসনে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিধান ছিল। আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলনা। তাই বিরোধী জোট দু'নেত্রীর ১৫০ঃ১৫০ আসনে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতে নির্বাচনে বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে সরকার আইন সংশোধন করে। এতে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪২। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রিট্যারি জেনারেল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

৪৩। আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-৩৪৭।

৪৪। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী*, আল ইসলাহ প্রকাশনী, রাজশাহী ১৯৮৯ পৃঃ-১৩

৪৫। Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum*, University Press Limited, Dhaka 1993. Page 24

৪৬। সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, মে-১৬, ১৯৮৬ পৃঃ ২০

৪৭। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ১৪১-১৪৪ ১৪১, ১৪

৪৮। Government of the people's Republic of Bangladesh. *Election Commission report*: Jatiya Sangsad Election, 1986 (Dhaka-1988) Cited, Mohammad A Hakim, Ibid page 25 -26

৪৯। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪

৫০। *পূর্বোক্ত*-পৃঃ-৮৬

৫১। *The New Nation,* Dhaka 13 July 1987.

৫২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, নভেম্বর১৮, ১৯৮৭

৫৩। *The Bangladesh Observer,* December -4, 1987

৫৪। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৫ ডিসেম্বর '৮৭

৫৫। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ১৫

৫৬। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী,

৫৭। *The Bangladesh Observer*, 4th October 1984.

৫৮। *The Bangladesh Observer*, 16th October `84

উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর '৮৪ ঢাকায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। জাতীয় সমাবেশগুলোর সংবাদ পরিবেশনে সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের এবং খবরদারির প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ এ দিন পত্রিকা প্রকাশ করেন নি। এক দিন পর ১৬ অক্টোবর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং সমাবেশগুলোর সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

৫৯। সাপ্তাহিক *রোববার*, ২১ অক্টোবর ১৯৮৪ পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

৬০। দৈনিক *ইত্তেফাক* ২৫ অক্টোবর '৮৭

৬১। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা* , পৃঃ- ১৩

৬২। দৈনিক *ইত্তেফাক* -১১ নভেম্বর ১৯৮৭

৬৩। দৈনিক *ইত্তেফাক* -১৬ নভেম্বর ১৯৮৭

৬৪। *পূর্বোক্ত*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৭

৬৫। *পূর্বোক্ত*, ২০ নভেম্বর ১৯৮৭

৬৬। *পূর্বোক্ত*, ২৪ নভেম্বর '৮৭

৬৭। জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচী, দেখুন, *The Bangladesh Observer, Dhaka* - ১৫,১৬,১৭,২৩ নভেম্বর ১৯৮৭

৬৮। Muhammad A Hakim, *op.cit* page 29

৬৯। *Far Eastern Economic Review*, February 25, 1988 p- 20 উদ্ধৃত : Mohammad Abdul Hakim op.cit

৭০ । Mohammad A. Hakim *op.cit* p-31

৭১। The Bangladesh *Observer*, May 12, 1988

৭২। *Ibid* - May 13, 1988

৭৩। *Ibid* - May 13, 1988

৭৪। *Far Eastern Econimic Review*, June 23, 1988 p- 14 উদ্ধৃত: Munir Ahmed Chowdhury, Induction of 'Stale Religion' in the Constitution of Bangladesh" in Bangladesh Political Studies, Vol-ix-xiii, 1986-89 page-73

৭৫। *Ibid*

৭৬। Munir Ahmed Chowdhury, Induction of 'Stale Religion' in the Constitution of Bangladesh" in *Bangladesh Political Studies*, Vol-ix-xiii, 1986-89 page-74

৭৭। *Far Eastern Economic Review* - June 23, 1988. p-12. উদ্ধৃত: Munir Ahmed Chowdhury, op.cit

৭৮। *Ibid,* May 1988

৭৯। দৈনিক *সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৩ জুন, ১৯৮৮

৮০। Abdul Rashid Moten, *Political Dynamics of Islamization in Bangladesh*. p-6.

৮১। দৈনিক *সংবাদ*, ১৫ অগাস্ট, ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৮২। দৈনিক *সংবাদ*, ১৪ জুলাই '৮৮

৮৩। *পূর্বোক্ত*, ১৩ জুলাই '৮৮

৮৪। মতিউর রহমান নিজামী, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৩৩

৮৫। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ-১৫

৮৬। সাপ্তাহিক *রোববার*, ৭ নভেম্বর '৯০ পৃঃ- ২৩

৮৭। *পূর্বোক্ত*, ১৪ অক্টোবর '৯০ পৃঃ-১০

৮৮। দেখুন, ১৭ তারিখে প্রকাশিত *দৈনিক সংগ্রামসহ* জাতীয় *পত্রিকাসমূহ*

৮৯। সাপ্তাহিক *রোববার*, ১১ নভেম্বর '৯০ পৃঃ- ১৯

৯০। *পূর্বোক্ত*, ১৮ নভেম্বর '৯০ পৃঃ- ১০

৯১। দৈনিক *সংগ্রাম*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯০

৯২। *পূর্বোক্ত*, ১৮ নভেম্বর ১৯৯০

৯৩। *পূর্বোক্ত*, ২০ নভেম্বর ১৯৯০

৯৪। *পূর্বোক্ত*, ২২ নভেম্বর ১৯৯০

৯৫। দেখুন, পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ-১৫

৯৬। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী

৯৭। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ- ১৫

৯৮। দৈনিক *সংগ্রাম*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

৯৯। *পূর্বোক্ত*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১০০। *পূর্বোক্ত*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১০১। জামায়াত কেন্দ্রীয় কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত *দলিলপত্র* থেকে সংগৃহীত।

১০২। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ-১১

১০৩। *পূর্বোক্ত*, পৃঃ- ১২

১০৪। *পূর্বোক্ত* পৃ-১৩, *Bulletin, Jammat- E-Islami Bangladesh.* Vo-1, No-3, January 1990.

১০৫। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪

১০৬। সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১১ই নভেম্বর '৯০

১০৭। দেখুন, *রক্তাক্ত জনপদ*, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনা, ১৯৯২, পৃ-১৭৭-১৮৪

১০৮। ১৯৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার রমনা রেস্তোরাঁয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ৫ দফা পলিটিক্যাল সিস্টেম্ পেশ করেন।

১। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকতে পারবেন না এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট সময়ের জন্য একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন।

২। শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীম্ কোর্ট সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

৩। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করবেন।

৪। সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৫। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং এর পরপরই প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হবে। দেখুন- মতিউর রহমান নিজামী *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০

১০৯। দেখুন, ১৯৮৬ সালে ২৫-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের উদ্বোধনী ভাষণের *পুস্তিকা* -পৃ-৭

১১০। S. Abul Ala Mawdudi, *Islamic Law and its Introduction in Pakistan* (Lahore, Islamic Publications Limited, 1983) PP-43-44

১১১। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিযামী

Dhaka University Institutional Repository

১১২। হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৩১ এবং *Bulletin, Jammat-E-Islami Bangladesh.* Vol-1 No-6 April 1991.

১১৩। মতিউর রহমান নিজামী *প্রাগুক্ত*, পৃঃ৩২

১১৪। Bulletin, Jammat - E- Islami Bangladesh, Vol-1 No. –6 April 1991 Published by Publicity Department – Jammat-E- Islami Bangladesh.

১১৫। মতিউর রহমান নিজামী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-৩৪

১১৬। সাপ্তাহিক *রোববার*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৪ পৃঃ১৫

১১৭। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী

১১৮। *সাক্ষাৎকার*, আব্দুল কাদের মোল্লা, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১১৯। *সাক্ষাৎকার*, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী দল

৮,৭, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামীর পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী দলও তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে। মিছিল সমাবেশ, বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে দলগুলো সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। আন্দোলন করতে গিয়ে সংগঠনগুলোর নেতা কর্মীদের গ্রেফতার, নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। এছাড়া হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) এর নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ এর ব্যানারে ছোটছোট কয়েকটি ইসলামী দল সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ঃ

বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত হয়ে ওঠেন। প্রায় পুরো জীবন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের পর বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ রাজনীতিতে পদার্পণ বিশেষতঃ বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ রাজনীতিতে পদার্পণের পূর্বে এদেশের আলেম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। হযরত হাফেজ্জী

Dhaka University Institutional Repository

হুজুরের 'তওবার রাজনীতি' আলেম সমাজের উক্ত অংশের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে দিয়েছে। ইসলামে রাজনীতি নেই বা ইসলাম রাজনীতি থেকে মুক্ত এ ধরনের মন্তব্য এখন বাংলাদেশের কোন সচেতন আলেমের মুখে শোনা যায়না। কর্মকৌশল এবং পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের আলেম সমাজ আজ একমত যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতির বিকল্প নেই। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশের শাসকবর্গকে জাতীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ২৯শে মে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এক খোলাচিঠি প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি দেশের আর্থ- সামাজিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আলোকে তা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রয়োজন ছিল যে, আপনি একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও জারি করবেন এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি ও আল্লাহর ছায়া হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইহ-পরকালে সফলকাম হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যা আশা করেছিলাম, তা পাইনি,[১] মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্দলীয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনের পর পরই ২৯ নভেম্বার তিনি 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন' নামে নতুন দল গঠন করেন। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, আমাদের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ হল আত্মশুদ্ধির পথ। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ, রাসুলল্লাহর (সাঃ) জীবনাদর্শ অনুসরণ এবং অহমিকাবর্জিত নিষ্ঠার ওপর জোর দেন।[২] হাফেজ্জী হুজুরের (রাহঃ) নেতৃত্বে গঠিত খেলাফত আন্দোলন তাদের ঘোষণা অনুযায়ী মহানবীর (সাঃ) তরীকা মতেই এগিয়ে চলতে চায়। খেলাফত আন্দোলন তিনটি ধাপে তাদের কার্যক্রম অগ্রসর করতে চায়।[৩] প্রথম ধাপে মানুষকে শরীয়তের তালিম দিয়ে শরীয়ত

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্জিত ধ্যান ধারণা থেকে মস্তিষ্ক পবিত্র করা। দ্বিতীয় ধাপে মানুষের ভেতরে শরীয়ত প্রীতি সৃষ্টি করে তা হুবহু অনুসরণের জন্য তার মনকে পবিত্র করা এবং তৃতীয় ধাপে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পবিত্র করার জেহাদে অবতীর্ণ হওয়া। জেহাদের তিনটি কাজ।[৪] প্রথম কাজ হচ্ছে মানবীয় সংবিধান ও সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে খোদায়ী সংবিধান ও সরকারের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বৈষম্য ও কারসাজির বিলুপ্তি ঘটিয়ে ইনসাফের অর্থনীতি কায়েম এবং তৃতীয় কাজ হচ্ছে খোদায়ী বিচারবিধি চালু করে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিরাপদ ও নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে[৫] ক) সমগ্র বিশ্বব্যাপী খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা সম্প্রসারিত করা খ) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করা। খেলাফত আন্দোলনে গঠনতন্ত্রে ৫ দফা উদ্দেশ্য এবং পনের দফা কর্মনীতির উল্লেখ রয়েছে। খেলাফত আন্দোলনের প্রধানকে বলা হয় 'আমীরে শরীয়ত'। খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠনে তিনটি পরিষদ থাকার কথা গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে মজলিশে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ, মজলিশে আমেলা বা কর্ম পরিষদ এবং মজলিশে উমুমী বা সাধারণ পরিষদ। মজলিশে শূরা খেলাফত আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

খেলাফত আন্দোলনের দৃষ্টিতে গোটা মুসলিম মিল্লাত একই পার্টির অন্তর্ভুক্ত এবং সকলের জন্মগত দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। "পাকিস্তান জন্ম নিয়েছিল এ দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। অথচ এ দায়িত্ব অবহেলা করে আমরা সবাই আল্লাহ ও জনগণের সাথে ওয়াদা খেলাফের পাপ করছি। এর ফলে বহু রক্তপাতের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হল। শুধু তাই নয়, এখনও আমরা অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তাই এ পাপ থেকে আমাদের একযোগে সবাইকে তওবা করতে হবে। গত নির্বাচনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর এ তওবারই ডাক দিয়েছেন। মূলতঃ প্রতারণার রাজনীতি থেকে আল্লাহর প্রবর্তিত সততার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের নামই তওবার রাজনীতি।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকার উপজেলা নির্বাচনের উদ্যোগ নিলে খেলাফত আন্দোলন অন্যান্য দল ও জোটের মত সে নির্বাচন বয়কটের আহবান জানায়।[৭] খেলাফত প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ বলেন, উপজেলা নির্বাচনের প্রচেষ্টা প্রহসনপূর্ণ ও অর্থহীন এবং এ নির্বাচন করার অধিকার সামরিক সরকারের নেই।[৮] খেলাফত আন্দোলন নেতৃবৃন্দ বলেন, সামরিক সরকার অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় এ সরকারের ছত্রছায়ায় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আশা করা যায় না। উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মুখোমুখি অবস্থান দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে খেলাফত আন্দোলন প্রধান আশংকা প্রকাশ করে সামরিক সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অনতিবিলম্বে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।[৯] ১৯৮৪ সালে বিরোধী দল ও জোট সমূহ এরশাদ সরকারের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করলেও খেলাফত আন্দোলন তা করেনি। খেলাফত প্রধান এরশাদ সরকারকে অবৈধ ও অনৈসলামিক সরকার বলে অভিহিত করেন এবং এ জন্যই সরকারের সাথে সংলাপে যোগ দেননি বলে মন্তব্য করেন।[১০] তাঁর মতে, সংলাপে বসার অর্থ হচ্ছে অবৈধ ঘোষিত সরকারের বৈধতা মেনে নিয়ে এর হাত শক্তিশালী এবং আয়ু বাড়ানো। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, সামরিক বাহিনীর পবিত্র দায়িত্ব হলো দেশ রক্ষ করা। সুতরাং সেনাবাহিনীর উচিত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যথাযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের হাতে অর্পণ করে স্বীয় কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ করা।[১১] অজস্র সমস্যা জর্জরিত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুখী সমৃদ্ধ দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ জাতিতে রূপান্তরের উপায় উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে জাতীয় নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক[১২] আহবান করেন। বৈঠকে হাফেজ্জী হুজুর তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিলাম যে, বর্তমান সরকার, না ইসলামী সরকার, না জাতীয় সরকার। তাহাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, চারি প্রকারের জুলুম যথা জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

উপর জুলুম, সম্পদের উপর জুলুম, ইজ্জতের উপর জুলুম ও ঈমানের উপর জুলুম আজ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। দেশবাসীর ধর্ম, প্রাণ, সম্মান, মান কোন কিছুই আজ নিরাপদ নহে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও পত্র পত্রিকায় অহরহ জুলুমের খবর ছাপা হইতেছে। শাসকরা আজ শোষকের ভূমিকায় নামিয়াছে। রক্ষকরা আজ ভক্ষক সাজিয়াছে। ইনসাফের আদালত জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। দুর্নীতি আজ প্রশাসন যন্ত্রের ভূষণ হয়ে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ করা আজ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে"।[১৩] এ প্রেক্ষাপটে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, আমি আমার জেহাদের দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ধাপের কার্যক্রম নির্ণয়ের জন্য আমি জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ জরুরি ভেবে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছি। হাফেজ্জী তাঁর বক্তৃতায় নিজের দলের পক্ষে তিনটি দাবি জাতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে পেশ করেন।[১৪] এগুলো হলো (১) অনতিবিলম্বে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র অভ্ বাংলাদেশ নামে আখ্যায়িত করা। (২) দেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে খসড়া গঠনতন্ত্র পেশ এবং এক মাস পরে এর উপর রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা করা।[৩] দেশের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে ঐ শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ উপরোক্ত তিনটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে আহবান জানিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ের ভিতর এগুলি বাস্তবায়ন না হলে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে সকলকে সাথে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদের কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। গোলটেবিল বৈঠকে ১৫ দলের পক্ষ হতে অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, জনগণের মৌলিক অধিকার, সভা, মিছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দান, ১৯৮৪ সনের শীত মওসুমে ইউনিয়ন, থানা পরিষদের নির্বাচনের পূর্বেই সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান- এ তিন দফা লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ১৯৮৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে একটি খোলা চিঠি প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি দেশবাসীর জান,মাল, ইজ্জত ও ধর্মের ওপর জুলুম থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জেহাদে সিপাহ্সালারের ভূমিকা পালনের জন্য জেনারেল এরশাদের প্রতি আহবান জানান। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমস্ত সহচর ও দোস্ত আহবাবসহ এরশাদের কমান্ডে দ্বীন পুনরুজ্জীবনের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং জান মাল উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১৬] অন্যথায় হাফেজ্জী হুজুর সাধ্যানুসারে তাঁর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহারির, তাবলীগ, তালিম ও তাজকিয়ার মাধ্যমে জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে এরশাদ সরকার বিরাধী আন্দোলন তীব্রতর হলে ১১ অক্টোবর মানিকমিয়া এভিনিউতে এক জনসভায় এরশাদ আন্দোলনত জোট ও দলের বিরুদ্ধে ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ইসলামপন্থী এবং ইসলামবিরোধী হিসেবে বিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করেন। খেলাফত প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ সরকারের এ হীন ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার ২২দল এবং ২২দল বহির্ভূতদের ইসলামবিরোধী ও ইসলাম পন্থী বলে বিভক্ত করে হানাহানির সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসেল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের জুলুম নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।[১৭]

এরশাদ সরকার ঘোষিত নীতি এবং কর্মসূচীর ব্যাপারে জনগণের মতামত নেয়ার উদ্দেশ্যে গণভোট গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে খেলাফত আন্দোলন এর বিরোধিতা করে। গণভোট অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পূর্বে ১৫ মার্চ '৮৫ বায়তুল মোকাররমে আহূত খেলাফত আন্দোলনের সমাবেশ সরকারের বাধার মুখে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সরকার খেলাফত আন্দোলন এবং সম্মিলিত সংগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং নেতা কর্মীদের ওপর শারীরিকভাবে নির্যাতন চালায়। খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহকে সরকার গৃহবন্দী করে রাখে। এ প্রেক্ষিতে হাফেজ্জী হুজুরের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়, সরকার দেশের সকল রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সকল মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করে সামরিক আইন জারি রেখে কয়েক প্রকারের লক্ষ লক্ষ পোস্টার ও নির্বাচনী অন্যান্য খাতে কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ অপব্যয় করে প্রহসনমূলক গণভোট দিয়ে স্বৈরশাসন চালাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রহসনমূলক গণভোটকে বয়কট করার আহবান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, "আপনারা এরশাদী গণভোট কেন্দ্রে গিয়ে ফেরাউনী শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেবেন না। জাতির দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করার সুযোগ করে দেবেন না।"[১৮]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী সকল বিরোধীদল ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কট করে। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এরশাদকে মোকাবেলার জন্যই তিনি প্রার্থী হয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ বলেন, "প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমি এক নীতির ওপর অটল আছি। এ সরকারের কোন পদক্ষেপই চ্যালেঞ্জহীন হতে দেইনি। তাই নির্বাচনে তাঁকে (এরশাদকে) মোকাবেলার জন্যেই প্রার্থী হয়েছি।"[১৯] নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে তিনি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বাদ দিয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানান।[২০] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ বলেন, "সকল রাজনেতিক দল যখন নিশ্চুপ তখন এই সরকারকে আমিই সর্বপ্রথম অবৈধ ও অনৈসলামী ঘোষণা করি। কিন্তু কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করেনি।[২১] ভোটদান প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ বলেন, "ভোট একটি জাতীয় আমানত এবং পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনি কর্তব্য। দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বস্ত লোককে নির্বাচিত করাই ভোটারদের দায়িত্ব। অযোগ্য পাত্রে ভোট দান আমানতের খোয়ানত, বিশ্বাস- ঘাতকতা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের শামিল।"[২২] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ঢাকায় খেলাফত আন্দোলনের নির্বাচনী জনসভায় হাফেজ্জী হুজুর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ক্ষমতাসীনদের পাপাচারে অংশীদার হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য সার্বজনীন তওবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে ও এ বছর নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। প্রচলিত নির্বাচনপদ্ধতি যোগ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের নির্ভরযোগ্য পন্থা না হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সার্বিক সংকটময় পরিস্থিতি থেকে শান্তিতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে বিকল্প হিসেবে তিনি এ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। হাফেজ্জী হুজুর আরও বলেন, সমস্যার একমাত্র সমাধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। তিনি খেলাফতে রাশেদার অনুসৃত 'শূরা' পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার অঙ্গীকার করেন।[২৩] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, সামরিক শাসনের অবসানে অবৈধ সরকারের উচ্ছেদ এবং আন্দোলনে সংগঠিত হবার জন্যেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি।[২৪] নির্বাচনে হাফেজ্জী হুজুর প্রদত্ত ভোটের ৫.৬৯% ভাগ পেয়ে দ্বিতীয় হন। লেঃ জেঃ এরশাদের পক্ষে ৮৩.৫৭% ভাগ দেখিয়ে তাঁকে বিপুল ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।[২৫] ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত 'রাষ্ট্রধর্ম' বিলকে খেলাফত আন্দোলন সমর্থন দান করে।[২৬] কিন্তু পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের ধোঁকাবাজি বুঝতে পেরে খেলাফত আন্দোলন সরকারের উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত অষ্টম সংশোধনীর বিরোধিতা করে। খেলাফত প্রধান মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের জনগণের ইসলামী হুকুমতের প্রতি আকাংখা থেকে স্বার্থ হাসেলের জন্য সরকার অতীতের শাসকগোষ্ঠীর মত ইসলামের নামে জনগণকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। সরকার রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতা করার নতুন করে সুযোগ দিয়েছেন।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ঃ

১৯৮৪ সালের ২১অক্টোবর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহর নেতৃত্বে ১১টি রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' নামে রাজনৈতিক জোটটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ জোটের নামকরণ করা হয় খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ।[২৮] সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ[২৯] গঠন উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, সংগ্রাম পরিষদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং আশু লক্ষ্য হচ্ছে অনতিবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের একটি বিপ্লবী সরকার গঠন, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। হাফেজ্জী এরশাদ সরকারের অবৈধ ও অনৈসলামিক শাসন উৎখাত করার জেহাদে অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, এই জেহাদের মধ্যে দিয়ে খোদায়ী লানত ও মানবীয় জিল্লতি থেকে মুক্তি আসবে। ১৯৮৪ সালের ১১ই অক্টোবর মানিক মিয়া এভিনিউতে জনদলের জনসভায় ইসলাম পন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এরশাদের আহবানের পর সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জরণ ওঠে এরশাদের আহবানে বিরোধীদলের আন্দোলনকে বিভক্ত করার জন্য এই পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে পরিষদের অন্যতম নেতা মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, এরশাদের আহবানের কারণে সংগ্রাম পরিষিদ গঠিত হয়নি।[৩০] পরিষদ গঠনের পর ২৬ অক্টোবর বায়তুল মোকাররম চত্বরে আয়োজিত দোয়া সমাবেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্বলিত ৩ দফা দাবি জানানো হয়।[৩১] ১৯৮৫ সালের ২১ শে মার্চের প্রহসনমূলক গণভোটের বিরুদ্ধে আহুত খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ পুলিশের হস্তক্ষেপে বানচাল হয়ে যায়। পুলিশ হাফেজ্জী হুজুরকে সমাবেশে যেতে বাধা দেয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। পুলিশ পরিষদ নেতা মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

হামিদুল্লাহসহ অন্যান্য নেতা কর্মীকে দৈহিকভাবে নির্যাতন চালায় এবং গ্রেফতার করে। পরিষদ নেতা মেজর (অবঃ) আব্দুল জলিলকেও পুলিশ গৃহবন্দী করে রাখে।[৩২] ১৯৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয় সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের জাতীয় সমাবেশ। সমাবেশের ঘোষণাপত্রে সংগ্রাম পরিষদের ৩ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ৩ দফার অন্যতম দাবি হচ্ছে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো। সমাবেশে হাফেজ্জীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মাধ্যমে দেশকে বির্পয়ের হাত থেকে রক্ষা করার আহবান জানানো হয়। জাতীয় সমাবেশে হযরত হাফেজ্জী হুজুর বলেন, তাঁর নেতৃত্বে খেলাফত কায়েম হলে আর কোন দিন সামরিক শাসন আসবে না।[৩৩] সম্মিলিত সংগাম পরিষদ সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করার কথা ঘোষণা করে। পরিষদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ জেলা ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের পদ বিলুপ্তির ঘোষণাকে সামরিক শাসনের অবসান মনে করেনা। সংগ্রাম পরিষদ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে দেশবাসীকে সামরিক শাসন অবসানের আন্দোলনকে তীব্রতর করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জেহাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আহবান জানান।[৩৪]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনঃ

চরমোনাইর পীর সাহেব এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা মাওলানা ফজলুল করীমের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শাসনতন্ত্র আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরমোনাইর পীর বলেন, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং অগ্রগতির গ্যারান্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে যৌথ নেতৃত্ব ভিত্তিক ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন গঠন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[৩৫] দেশের প্রচলিত অনৈসলামিক নীতি এবং জাহেলী সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সাধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[৩৬] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সকলপ্রকার স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে একটি ইসলামী সরকার গঠনের লক্ষ্যে আন্দোলন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কোন অবস্থাতেই সামরিক আইন জারি বা সংবিধান মুলতবী করার অবকাশ নেই।[৩৭] ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ শাপলা চত্বরে আহুত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সমাবেশ পুলিশ বাহিনীর বেপরোয়া হামলার কারনে পন্ড হয়ে যায়। পুলিশী হামলায় বহুলোক আহত হয়। খেলাফত আন্দোলন নেতা মাও. আজীজুল হকসহ ৪০ জনের বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়।[৩৮] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন পরবর্তীতে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে '৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এরশাদ সরকারের পতনের পর ২২ শে ডিসেম্বর দেশের বিশিষ্ট ওলামা মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী এবং ৭টি ইসলামী দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় ইসলামী ঐক্যজোট নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠিত হয়।[৩৯] সভায় জোটের মাধ্যমে দেশের সকল মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে '৯১র জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শক্তিকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে জাতিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। এরশাদ সরকারের পতনের পর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম এক বিবৃতিতে মজলুম মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে অনৈসলামিক জালেম ও মুনাফেক সরকারের পতনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েজী জামায়াত ঃ

বাংলাদেশ ফরায়েজী জামায়াতের সভাপতি পীর মোহসীন উদ্দিন (দুদু মিয়া) ৮ নভেম্বার '৯০ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সম্মেলনে পীর মোহসীন উদ্দিন বলেন, ১৯৮২ সালে একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা হুকমির সম্মুখীন। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের নামে অধর্ম চালু করে সরকার শেরেক বেদাতকে উৎসাহিত করেছে। দেশের এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে তিনি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পীর দুদুমিয়া দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে একমঞ্চে সমবেত হয়ে অভিন্ন স্লোগান নিয়ে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহবান জানান।[৪২]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঃ

১৯৮৪ সালে মতাদর্শগত পার্থক্যের কারনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) জলিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে পদত্যাগ করে একই সালের অক্টোবর মাসে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' গঠন করেন। মেজর জলিলের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ২১ দফা মেনিফেস্টোর মধ্যে ৭ দফাই ছিল ইসলামী আদর্শ মোতাবেক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে নিবেদিত। তিনি দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে বৃহত্তর একক ইসলামী আন্দোলনে জোটবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।[৪৩] হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে মেজর জলিল ইসলামী আন্দোলন ও সরকার বিরোধী আন্দোলন ভূমিকা রাখেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হওয়ায় ১৯৮৫ সালে তিনি একমাস গৃহবন্দী ছিলেন। এরপর বিশেষ নিরাপত্তা আইনে ১৯৮৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর হতে ১৯৮৮ সালের মার্চ পর্যন্ত কারাগারে আটক ছিলেন।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঃ

বাংলার জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবতর সমম্বয়ধর্মী ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য চেতনা সমৃদ্ধ আপসহীন নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনের একটি অংশ এবং ইসলামী যুবশিবির একীভূত হয়ে "বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস" নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৪৫] আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতের মুক্তি ও প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায় হিসাবে বালাদেশ খেলাফত মজলিশ প্রচলিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রথমে বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে চায়। খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় কাঠামো অভিভাবক পরিষদ, আমীরে খেলাফত মজলিস, কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সমম্বয়ে গঠিত।[৪৬] মজলিশে শূরা খেলাফত মজলিসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। মজলিশের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এরশাদ সরকারকে ছদ্মবেশী সামরিক সরকার আখ্যায়িত করে এর ছত্রছায়ায় কোন নির্বাচনী ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য সকল বিরোধীদলের প্রতি আহবান জানানো হয়।[৪৭] খেলাফত মজলিশের অন্যতম মৌল কর্মসূচী হচ্ছে দেশে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, ফাসেক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা। স্বৈরাচারের বিরোধিতা করা ইসলামের শিক্ষা। খেলাফত মজলিস

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ভিত্তিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এজন্য খেলাফত মজলিস এরশাদের স্বৈরশাসনসহ সকল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।[৪৮] এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে গিয়ে ঢাকায় খেলাফত মজলিসের বর্তমান মহাসচিব এ.আর.এম আব্দুল মতিনসহ ৪০ জন নেতা কর্মী ৩ মাস জেলে আটক ছিলেন। শত শত মজলিশ কর্মী পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে খেলাফত মজলিসের অনেক কর্মী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় কারাবরণ করে।[৪৯] এরশাদের পতনের পর খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা আজীজুল হকের নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয় এবং ঐক্যজোটের ব্যানারে ১৯৯১ এর ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর সিলেটের মাওলানা ওয়বায়দু হক সিলেট-৫ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে একমাত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তথ্য সংকেত ও টীকা ঃ

১। দেখুন, পুস্তিকা, *দেশের বর্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের প্রতি সর্বজনমান্য আলেমে হক্কানী শায়খে কামেল হযরত মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ ছাহেবের (হযরত হাফেজ্জী হুজুরের) পত্র*, পৃষ্ঠা- ১৪-১৫

২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা ৩০ নভেম্বার ১৯৮১

৩। *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, কেন্দ্রীয় দফতর কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা- ৬

৪। *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা -৭

৫। *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা - ৮

৬। আখতার ফারুক, *খেলাফত আন্দোলন কি ও কেন?* আল আশরাফ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা -১১

৭। *দৈনিক দেশ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

৮। *পূর্বোক্ত*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

৯। *পূর্বোক্ত*, ১৫ ই মার্চ, ১৯৮৪

১০। *দৈনিক সংবাদ*, ১০ জুলাই, ১৯৮৪

১১। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ জুলাই, ১৯৮৪

১২। হাফেজ্জী হুজুরের আহবানে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে ১৫ দলের পক্ষে পীর হাবীবুর রহমান, নূরে আলম সিদ্দিকী, মনজুরুল আহসান খান, দিলীপ বড়ুয়া, আই.ডি.এল এর মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা আব্দুস সোবহান, পিপলস্ লীগের (কাজী) নূর মোহাম্মদ কাজী, ইউপিপি'র আব্দুর রহীম আজাদ, ডেমক্রটিক লীগের (মুয়াজ্জেম) শহিদুল আলম সাঈদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট্ লীগের আব্দুল মতিন, রিপাবলিকান পার্টির ওয়ালীউল ইসলাম (সুরুক্ক মিয়া), ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির এডভোকেট হাবীবুল্লাহ চৌধুরী, লেবার পার্টির আব্দুল খালেক, ইসলামী ছাত্র শক্তির শওকত হোসেন প্রমূখ অংশ গ্রহণ করেন। বৈঠকের পূর্বাহ্নে আখতারুজ্জামান, খ.ম. জাহাঙ্গীর, খন্দকার ফারুকসহ কেন্দ্রীয় ছাত্র সগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল হাফেজ্জী হুজুরের সাথে সাক্ষাত করে। সূত্র - *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৪ জুলাই '৮৪

১৩। দেখুন, *গোলটেবিল বৈঠকে হাফেজ্জী হুজুরের ভাষণ*, উদ্বৃত আখতার ফরুক, খেলাফত আন্দোলন, পৃষ্ঠা -২৮

১৪। *বাংলার বাণী*, ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

১৫। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

১৬। দেখুন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সমীপে মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহর *খোলা চিঠি*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

১৭। *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর, '৮৪

১৮। দেখুন, গৃহবন্দীর পর খেলাফত আন্দোলন প্রধান মোহাম্মদুল্লাহ কর্তৃক প্রচারিত *লীফলিট্*।

১৯। *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২১সেপ্টেম্বর, '৮৬

২০। দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, সেপ্টেম্বর, '৮৬

২১। *দৈনিক খবর*, ২১ সেপ্টেম্বর, '৮৬

২২। *বালার বাণী*, ১১ অক্টোবর, '৮৬

২৩। *দৈনিক খবর*, ১১ অক্টোবর, '৮৬

২৪। *দেনিক ইনকিলাব*,১০ অক্টোবর '৮৬

২৫। Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum* (Univesity Press Ltd.) page 28

২৬। Munir Ahmed Chowdhury "Induction of State Religion` in the constitution of Bangladesh" in '*Bangladesh Political Studies*' vol- IX-XIII, 1986-89 page – 74.

২৭। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২জুলাই ১৯৮৮

২৮। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০ মে ১৯৯০

২৯। ১৯৮৪ সালের ২১শে অক্টোবর মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ১১টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামক' রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। জোটে অন্তর্ভুক্ত দলগুলো হচ্ছেঃ হাফেজ্জীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন, মেজর জলীলের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, মাও. আবদুর রহীমের নেতৃত্বাধীন আইডিএল, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, ইসলামী যুব আন্দোলন, খাদেমুল ইসলাম জামায়াত, মজলিশে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, মজলিশে দাওয়াতুল হক ও ইসলামী যুব শিবির।

৩০। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ অক্টোবর '৮৪

৩১। *পূর্বোক্ত*, ২৭ অক্টোবর '৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৩২। দেখুন, মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুজুর) পক্ষে প্রচারিত সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের লীফলিট্‌।

৩৩। *দৈনিক সংগ্রাম* - ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৫

৩৪। *বাংলার বাণী*- ১লা মার্চ, ১৯৮৫

৩৫। সাংবাদিক সম্মেলন মাওলানা ফজলুল করিমের বক্তব্য থেকে । *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ মার্চ, '৮৭

৩৬। দেখুন, *পরিচিতি*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

৩৭। দেখুন, *নীতিমালা*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, প্রকাশনায় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, কেন্দ্রীয় দপ্তর।

৩৮। *দৈনিক সংগ্রাম* - ১৪ মার্চ '৮৭

৩৯। ঐক্যজোটভুক্ত ৭টি দল হচ্ছে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস ও ইসলামী আন্দোলন।

৪০। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ ডিসেম্বর, '৯০

৪১। *পূর্বোক্ত*, ৬ ডিসেম্বর, '৯০

৪২। *পূর্বোক্ত*, ৯ নভেম্বার '৯০

৪৩। *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৮ নভেম্বার, '৮৪

৪৪। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ নভেম্বার, '৯০

৪৫। দেখুন, *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

৪৬। দেখুন, *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, পৃষ্ঠা-৬-৯

৪৭। *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ ডিসেম্বর, '৮৯

৪৮। *সাক্ষাৎকার*, এ, আর, এম. আব্দুল মতিন, মহাসচিব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

৪৯। *সাক্ষাৎকার*, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ঃ

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের প্রায় সর্বময় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে সেনা প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করেন। তৎকালীন সরকারি দলের নেতৃত্বের সংকট এবং মন্ত্রীদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে জেনারেল এরশাদ শাসন ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং দু'বছরের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তিনি শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক সরকারের পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। ছাত্রদের প্রতি এরশাদ সরকারের নির্যাতন এবং কঠোর মনোভাব রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাবিয়ে তোলে। মূলতঃ ছাত্র সংগঠন গুলোর কার্যক্রমই এরশাদ সরকারের রিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৫ দলীয় জোট এবং ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে তারা এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এরশাদ তাঁর পূর্বসূরী জেনারেল জিয়াউর রহমানের মত সামরিক সরকারকে বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে ক্ষমতা গ্রহণকালীন তাঁর ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হন এবং ক্ষমতাকে স্থায়ী করার বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করেন। বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এরশাদ রাজনৈতিক দল গঠন, গণভোট অনুষ্ঠান, স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৫ দল ও ৭ দলের

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি.এন.পি) হাতে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৫ দল ও ৭ দল সামরিক আইন প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৫ দলীয় ঐক্যজোট ৪র্থ সংশোধনী পূর্ব শাসনতন্ত্রের এবং ৭দল বিশেষতঃ বিএনপি স্থগিত সংবিধানের পুনর্বহালের দাবি জানায়। তাদের এই ৫ দফা বহির্ভূত শাসনতান্ত্রিক বিতর্কে এরশাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রথমেই বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে উভয় জোট এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হয় যে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ জনগণের মতামত নিয়ে সংসদে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ১৯৮৪ এবং ১৯৮৭ সালে দু'বার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলেও আন্দোলনরত প্রধান দু'টি জোটের পারস্পরিক ভুল বোঝাবোঝি; দলীয় সংকীর্ণতা এবং নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ে ভূষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। দলীয় সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিত্ব সংঘাতের কারনেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কয়েকবার চিড় ধরেছে। আন্দোলনের কৌশলগত প্রশ্নে ১৫ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে ৫ দল আলাদা জোট গঠন করেছে।

প্রথম দিকে বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনেক নেতা আন্দোলনে ডিগবাজি খেয়েছেন। তারা সরকারের সাথে গোপন সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রীগণের সবাই ছিলেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা এবং রূপকারদের অন্যতম। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শরিক জোট ও দলগুলোর কিছু নেতা নেত্রীর উদ্দেশ্যেমূলক বক্তব্য এবং সংকীর্ণ দলীয় স্লোগান অনেক সময় আন্দোলনকে সঠিক ধারা থেকে বিচ্যুত করেছে। নেতৃবৃন্দের অসংলগ্ন বক্তব্য সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভাঙ্গন সৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল একাধিকবার।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়েও সে ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। '৯০ এর ১০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনার 'জয় বাংলা' স্লোগান আন্দোলনরত জোট ও দলগুলোর ঐক্যকে নষ্ট করে কিছুদিনের জন্য হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাসবোধের বিস্তার ঘটায়। ছাত্র সমাজের বলিষ্ঠ প্রদক্ষেপের কারণে তা বেশি দূর এগোয়নি। যুগপৎভাবে বিভিন্ন জোট ও দলের সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যহত থাকলেও একমঞ্চের আন্দোলন করার জন্য সচেতন মহল থেকে দাবি ওঠেছিল। কিন্তু ৮দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা 'এক মঞ্চের' আন্দোলনের ব্যাপারে সরাসরি নেতিবাচক মন্তব্য করেন। তাছাড়া শেখ হাসিনার "৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো অবৈধ' বক্তব্যে ৭দলীয় জোটের সাথে ৮দলীয় জোটের সম্পর্কের টানাপোড়ন ঘটে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার বিরোধী জোট ও দলগুলোর মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ সৃষ্টি করে সরকারবিরোধী আন্দোলনকে গতিচ্যুত করেছে। ৮দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং জোটের অপরাপর নেতার জামায়াত-শিবির নির্মূল অভিযানের আহবানের ফলে ১৯৮৮ সালে দেশব্যাপী জামায়াত শিবিরের সাথে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের সংঘাত সংঘর্ষ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে লাইনচ্যুত করেছে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সন্ত্রাস, নির্যাতন, গ্রেফতার, জরুরি অবস্থা জারির পাশাপাশি এরশাদ সরকার আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ঐক্য বিনষ্ট করতে রাজনৈতিকভাবেও চেষ্টা করেছিলেন। সরকার ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে 'রাষ্ট্র ধর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামী দল ও জনগণের সমর্থন আদায়ের ফন্দি করেছিলেন। কিন্তু সরকারপন্থী কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন ইসলামী দল এরশাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'রাষ্ট্র ধর্ম' বিলকে সমর্থন করেনি। প্রায় সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণাকে' রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এরশাদ অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল ও জনগণের সমর্থনের জন্য বলেছেন ইসলামী মৌলবাদীদের দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় বরং ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষমতায়

Dhaka University Institutional Repository

আসার পথ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রধর্ম আইন প্রনয়ণ করেছেন। আন্দোলনরত দলগুলোর সিদ্ধান্তহীনতা আন্দোলনকে বিজয়ী করতে বাধাগ্রস্ত করেছে। সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠলে বিভিন্ন দল ও জনগণের সাথে রাজপথের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে জামায়াতের ১০ জন সদস্য তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার কারনে দলীয় সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেননি। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার নিজেই তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে। মূলতঃ রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাসবোধ, নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা, দলীয় সংকীর্ণতা, সিদ্ধান্তহীনতা, সর্বোপরি ব্যক্তিত্বের সংঘাত এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে প্রলম্বিত করে, বিজয় অর্জনে দেরি হয়। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সব দল ও জোটের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যদি আরো আগে হত তাহলে সরকার আরো আগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হত। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য সরকারি এজেন্টরা সুকৌশলে রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই দীর্ঘ ৯ বছর ব্যাপী এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন একাধিকবার সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল।

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ অতীতের ন্যায় গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২২ দলের ছাত্র সংগঠনগুলো 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' (APSU) গঠন করে আন্দোলনকে সঠিক গতিধারায় পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে 'যুক্তঘোষণা' প্রদানে বাধ্য করে। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠনের ৪০ দিনের মাথায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট ঐতিহাসিক যুক্ত ঘোষণা প্রদান করে। ১৯ নভেম্বার যুক্তঘোষণার পর সরকার বিরোধী আন্দোলন নবযৌবন লাভ করে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। যুক্ত ঘোষণার পর জনগণের মধ্যে বিরোধী দলের আন্দোলনের ব্যাপারে আস্থা ফিরে আসে। জনগনের সেন্টিমেন্ট বুঝতে পেরে এরশাদের প্রধান সমর্থক গোষ্ঠী 'সেনাবাহিনী'ও এরশাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। অবশেষে গনআন্দোলনের ফলে ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ বিরোধী জোট ও দলের মনোনীত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এরশাদ দুর্নীতিকে 'প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' করেছিলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এরশাদ সরকারের অন্যতম নেতিবাচক কর্মকান্ড ছিল নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কলুষিত করা। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা প্রায় শুন্যের কোঠায় উপনীত হয়। ভোট কেন্দ্র দখল, ভোট ছিনতাই, ভোট ডাকাতি, কারচুপি, মিডিয়া ক্যু, এরশাদ আমলের নির্বাচনগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এরশাদের শাসনকালীন সময়ে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিদেশী সংস্থা এবং রাষ্ট্রগুলোর কাছে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়ায় নির্বাচনের প্রতি জনগণের এবং বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের আস্থা ফিরে আসে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য এরশাদ সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা, জরুরি অবস্থা জারি এমনকি কার্ফ্যু পর্যন্ত জারি করেছেন। সরকার বিরোধী আন্দোলন, হরতাল, বিক্ষোভ, রক্তপাত, রাজনৈতিক আন্দোলনে হত্যাকান্ড ইত্যাদির দিক থেকে এরশাদ সরকারের শাসনকাল রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রধান দু'টি জোটের পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রথম থেকেই যুগপৎ আন্দোলনে শরিক ছিল। সরকার বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য ইসলামী দলও অংশ গ্রহণ এবং সমর্থন দান করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী এবং সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল। আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে জামায়াতের সকল প্রচেষ্টা নিবেদিত। জামায়াতে ইসলামী শুধু একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলই নয় বরং এটি একটি আদর্শবাদী দল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্বলিত একটি ইসলামী দলেরই ধারাবাহিকতা। ১৯৪১ সালে এ দলের যাত্রা শুরু হয়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংঘঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াতের একনিষ্ঠ এবং সিদ্ধান্তকারী ভূমিকার কারনে আইয়ুব সরকার জামায়াতে ইসলামীকে ১৯৬৪ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতসহ তৎকালীন সকল ইসলামী দল রাজনৈতিক এবং আদর্শিক কারনে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকার সকল ইসলামী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামায়াত ১৯৭৯ সালের মে মাসে পুনরায় স্বনামে বাংলাদেশে এর রাজনৈতিক কার্যক্রম আরম্ভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াত নীতিগতভাবে সামরিক শাসন বিরোধী। জনগণের সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে জামায়াত ইসলামকে বিজয়ী করতে চায়। সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিনষ্ট করে। দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে জামায়াত জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি মনে করে। তাই জামায়াত আদর্শগত এবং কৌশলগত কারনে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৩ সালের প্রথমার্ধে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক বিতর্ক শুরু হয়। ১৫ দলীয় জোট এবং এর প্রধান শরিক আওয়ামী লীগ ৪র্থ সংশোধনী পূর্ববর্তী '৭২ সালের সংবিধান পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করে। কোন কোন রাজনৈতিক দল ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান বহালের দাবি জানায়। এ সময় শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জাতীয় পরিষদেও শাসন ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠে। শাসনতান্ত্রিক এ বিতর্কে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াত সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রচেষ্টাকে জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিরোধী বলে মন্তব্য করে সামরিক সরকারকে এ ধরনের সুযোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য সকল দলের প্রতি আহবান জানায়। শাসনতান্ত্রিক এ বিতর্ক বাদ দিয়ে মুলতবি সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আহবান জানিয়ে সামরিক আইনের ভেতরেই জামায়াত সারাদেশে কয়েক লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। জামায়াতের এ প্রচারপত্র এবং বক্তব্য দেশের সচেতন মহলের নিকট প্রশংসিত হয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক বিতর্কটি একটি বড় ইস্যু ছিল। অবশেষে সকল দল এ ইস্যুটি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করার কারনে সামরিক সরকারও সংবিধান সংশোধনের সুযোগ পায়নি।

ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ প্রথমেই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। জামায়াত অতীত ইতিহাসের আলোকে সরকারের এ প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নীলনকশা

বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সামরিক শাসন দ্রুত প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি জানায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে '৮৪র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কিত এরশাদের ঘোষণায় জামায়াত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করার জন্য সকল দলের প্রতি জামায়াত বিশেষ অনুরোধ জানায়। এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনামলে প্রথম প্রকাশ্য রাজনীতির শুরুতে জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় 'কেয়ার-টেকার' সরকার গঠন করে এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ধরনের সরকার গঠনের প্রস্তাব এটাই প্রথম। জামায়াতের এ দাবির প্রতি আন্দোলনরত বিরোধী জোট ও দলসমূহের সমর্থন প্রথম দিকে পাওয়া যায়নি। ১৫ দল ও ৭দলীয় জোট কয়েক মাস পর এ দাবি সরকারের নিকট উত্থাপন করে।

'৮৪'র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এরশাদ সরকারের সাথে বিরোধী জোট ও দলের রাজনৈতিক সংলাপে জামায়াত 'কেয়ার-টেকার' সরকারের দাবি উত্থাপন করে। জামায়াত ১৫ দল ও ৭দলীয় জোটকে আহবান জানিয়ে ছিল ঐক্যবদ্ধভাবে সংলাপে অংশ গ্রহণের জন্য। কিন্তু ১৫ দল, ৭ দল, জামায়াত পৃথক পৃথকভাবে সংলাপে অংশ গ্রহণ করে। সংলাপে জোট ও দলগুলোর কোন একক দাবিও ছিলনা। জামায়াতের পক্ষ থেকে দু'জোটের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল এক সাথে সংলাপে যেতে না পারলেও সকল জোট ও দলের দাবি যদি এক হয় তাহলে সংলাপে সফলতা আসতে পারে। কিন্তু দু'জোটের পক্ষ থেকে কেয়ার-টেকার বা নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন দাবি উত্থাপিত হয়নি বরং এমন সব দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যা সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ছিল মাত্র। জামায়াত এবং ১৫ ও ৭দলীয় জোটের সব দল মিলে ২৩ দল যদি

Dhaka University Institutional Repository

একসাথে সংলাপে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারতো এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ার-টেকার সরকারের ঐক্যবদ্ধ দাবি জানাতে পারতো তাহলে '৮৪ সংলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো না।

আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামায়াত ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। সংসদে জামায়াতের ১০ জন সদস্য এরশাদ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকান্ডের গঠনমূলক বিরোধিতার পাশাপাশি সংসদের বাইরে রাজপথের আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে যখন সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে তখন বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। পদত্যাগ প্রশ্নে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেও জামায়াত দলীয় ১০ জন সদস্য ৩রা ডিসেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে রাজপথের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কোন দলের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করার ঘটনা বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটিই প্রথম। রাজপথের গণআন্দোলন এবং জামায়াত দলীয় সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য হয়ে এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। '৯০এ এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কার্ফ্যুর মধ্যেও জামায়াত সক্রিয়ভাবে গায়েবানা জানাজা এবং মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। এরশাদের পতনের পর কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের নাম মনোনয়নের ব্যাপারে প্রধান দু'জোটের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও জামায়াত তার পূর্ব ঘোষণায় অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কেয়ার-টেকার সরকার গঠনের দাবিতে অবিচল ছিল। দীর্ঘ মিটিং এবং আলাপ আলোচনার পর অবশেষে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে সকল জোট ও দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত এবং সঠিক গতিধারায় রাখার ব্যাপার জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াত আন্দোলনরত বিরোধী জোট ও দলের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলের যে কোন অনৈক্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বিধায় জামায়াত সব সময় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্য সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানিয়েছে। জামায়াতের দিক নির্দেশনা ভূমিকার কারনে এরশাদ সরকার সুকৌশলে ১৯৮৮ সালে ৮ দলীয় জোট এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলোকে জামায়াত -শিবিরের সাথে দেশব্যাপী সংঘাত - সংঘর্ষে লিপ্ত করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করেন।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির। ছাত্র শিবির জামায়াতের প্রায় সকল মিছিল, সমাবেশ, মহাসমাবেশ, হরতাল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পাশাপাশি ছাত্রশিবির যুগপৎভাবে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটায়। ছাত্রশিবির নিজ ব্যানারে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশ মিছিলের মাধ্যমে সামরিক শাসন বিরোধী জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া শিবির বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়েও ছাত্রসমাবেশ করে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে শিবিরের অনেক কর্মী নিহত হয় এবং অনেক নেতা কর্মী কারাবরণ করে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধী দলীয় অনেক নেতা কর্মী ডিগবাজি খেয়ে আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে সরকারি দলে যোগদান করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। বিরোধী দল ও জোটের অনেক বাঘা বাঘা নেতাও আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়ে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে জামায়াতে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যতিক্রম। জামায়াত আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে শরিক ছিল। জামায়াতের কোন পর্যায়ের নেতা আন্দোলন থেকে বিরত থেকে বা সরে পড়ে সরকারি দলে যোগদান করে স্বার্থসিদ্ধি করার চিন্তা করেননি। বরং আন্দোলনের স্বার্থে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নির্যাতন, কারাবরণ, সন্ত্রাস, হত্যা এমনকি ব্যক্তিস্বার্থ কিছুই জামায়াতকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের দৃঢ়তা, সততা এবং সক্রিয় ভূমিকা জামায়াতকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে। আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারনে জামায়াত বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশের বাইরেও জামায়াতের সুনাম এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ১৮টি আসন লাভের ফলে দেশে-বিদেশে জামায়াতের পরিচিতি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে জামায়াতের তৃতীয় অবস্থান জামায়াতের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সফল ভূমিকার কারনেই জামায়াতের এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারনে জামায়াত রাজনৈতিক মহলে অনেকটা একাকী ছিল। কিন্তু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারনে জামায়াত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীদের অনেক নিকটে আসার সুযোগ পায়। এতে জামায়াতের প্রতি বিরোধী নেতা কর্মীদের কঠোর মনোভাব শিথিল হতে শুরু করে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে জামায়াত রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান ভাল অবস্থানে রয়েছে। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারনে জামায়াতের গণভিত্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সুফল জামায়াতের জন্য নেতিবাচক ফলও নিয়ে এসেছে। জামায়াতের শক্তি সামর্থ্য বিরোধী দলের নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জামায়াতের প্রভাব ক্ষুন্ন করার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। জামায়াত রাজনৈতিকভাবে যতটুকু এগিয়ে গিয়েছে অভ্যন্তরীণভাবে ততটুকু শক্তি অর্জন করতে পারেনি। তাই ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় জামায়াত দৃঢ় অবস্থানে নিজকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচীর আধিক্যের কারনে জামায়াতের আদর্শিক এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটে। এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া জামায়াতের জন্য ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খেলাফত আন্দোলনসহ অন্যান্য ছোট ছোট ইসলামী দলও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখে। সরকার সমর্থক কিছু পীর এবং তাঁদের ভক্তগণ ছাড়া বাংলাদেশের সকল ইসলামী দল এরশাদের বিরোধিতা করে। যদিও এ সকল দলের কর্মসূচীর তীব্রতা খুব বেশি ছিলনা তারপরও তাদের অংশ গ্রহণ এরশাদের বৈধতার সংকটকে তীব্র করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরশাদের নিঃসঙ্গ রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এবং এর প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) এরশাদ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে মিছিল সমাবেশ অব্যাহত রাখেন। এরশাদ সরকারের বিভিন্ন ধরনের জুলুম থেকে জাতিকে উদ্ধারের লক্ষ্যে মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকার কামরাঙ্গীচরে 'গোলটেবিল' বৈঠক আহবান করেন। ১৫ দলীয় জোটের একটি প্রতিনিধিদল হাফেজ্জীর 'গোলটেবিল বৈঠকে' অংশ গ্রহণ করে। সামরিক আইন প্রত্যাহার, সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ তিন দফা লিখিত প্রস্তাব গোলটেবিল বৈঠকে ১৫ দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়। খেলাফত

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন উপজেলা নির্বাচন এবং এরশাদের গণভোট বর্জন করলেও ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ এরশাদের বিরুদ্ধে খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ প্রসঙ্গে হাফেজ্জী হুজুর সামরিক শাসন অবসান, অবৈধ সরকারের উচ্ছেদ এবং আন্দোলনে সংগঠিত হবার জন্যেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে মন্তব্য করেন।

মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ১১টি রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জরণ ওঠে এরশাদের আহবানে সাড়া দিয়ে এ জোট গঠিত হয়। অবশ্য জোট নেতৃবৃন্দ এ ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চের প্রহসনমূলক গণভোটের বিরুদ্ধে খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ পুলিশ বানচাল করে দেয়। হাফেজ্জী হুজুরকে সমাবেশে যেতে দেয়নি। তাঁকে এবং পরিষদ নেতা মেজর (অবঃ) জলিলকে পুলিশ গৃহবন্দী করে রাখে। ১৯৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সামরিক শাসন অবসানের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিমের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর শাসনতন্ত্র আন্দোলনও এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র আন্দোলন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। ফরায়েজী জামায়াত এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান মেজর (অবঃ) জলিল আন্দোলনে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখার কারনে ১৯৮৫ এবং ১৯৮৭ সালে দু'বার গ্রেফতার হন। ১৯৮৯ সালে কৌশলগত কারনে খেলাফত আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বের হয়ে ইসলামী যুব শিবিরের সাথে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠন করে। স্বৈরাচারের বিরোধিতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। মজলিস ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। খেলাফত মজলিস এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। আন্দোলন করতে গিয়ে মজলিসের নেতা এ. আর. এম. আব্দুল মতিনসহ (বর্তমান মহাসচিব) অনেক নেতা কর্মী দীর্ঘদিন জেলে আটক ছিলেন। অন্যান্য ছোট ছোট ইসলামী দলও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন করে।

ইসলামী দলগুলোর পারস্পরিক কাদাছোঁড়াছুঁড়ি এবং অনৈক্যের কারনে স্বতন্ত্রভাবে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করাও সম্ভব হয়নি। ইসলামী দলগুলোর কিছুটা সাংগঠনিক বিস্তৃতি থাকলেও গণভিত্তি সুসংগঠিত নয়। বাংলাদেশের ৮৫% জনগণ মুসলমান হওয়ার পরও ইসলামী দলগুলোর প্রতি জনসমর্থন ব্যাপকভাবে না থাকার কারন হিসেবে উল্লেখ করা যায় (ক) জনগণের মধ্যে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের অভাব (খ) ইসলামকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। (গ) আলেম সমাজ (ধর্মীয় নেতৃত্ব) ইসলামকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি। (ঘ) পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন (ঙ) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মানষের মন মগজকে সেক্যুলার করে তৈরী করছে (চ) ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্বকে সুকৌশলে পরস্পরবিরোধী করে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অব্যহত রয়েছে (ছ) সর্বোপরি ইসলামী দলগুলোর অনৈক্য এবং পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি।

বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো এখনো মুখ্য রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। স্বাধীনভাবে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। বাংলাদেশের ভূ-

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক এবং জনগণের আদর্শিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে ইসলামী দলগুলো স্বতন্ত্র ভূমিকা রেখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোকে নিন্মোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

১। ব্যাপক গণভিত্তি অর্জনের জন্য কার্যকর কর্মসূচী প্রদান করা।

২। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪। আদর্শ এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের মাঝে ইসলামী দলগুলোর পরিকল্পিত কাজ থাকা জরুরি, ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে রেখে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া।

৫। উলামা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার উদ্যোগ নেয়া।

৬। নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নেতিবাচক প্রচারণার বিপরীতে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭। মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান তরুণ সমাজের কাছে এখনো প্রশ্নবোধক, এ ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্য জনসম্মুখে উপস্থাপন করা দরকার।

৮। ইসলামী দলগুলোকে চরমপন্থী এবং গোঁড়ামি মনোভাব সব সময় পরিহার করে চলা।

৯। ব্যাপক ঐক্য সৃষ্টির জন্য ইসলামী দলগুলোকে খুঁটিনাটি বিষয়াবলী পরিহার করে ইস্যু ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো নিয়ামক কোন ভূমিকা রাখতে না পারলেও যুগপৎ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে স্বৈরশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতায় ইসলামের শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল করেছে। কর্মকৌশল এবং বিভিন্ন ইস্যুতে মত পার্থক্যের কারনে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো একক কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। ইসলামী দলগুলোর এই অনৈক্যের পেছনে আদর্শগত বিরোধের চেয়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বই বেশি ক্রিয়াশীল। নেতৃত্বের প্রশ্নে দলগুলো আপস করতে পারেনি বলে বৃহত্তর কোন ইসলামী জোট গঠিত হচ্ছে না। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা এরশাদ সরকারকে নৈতিকভাবে দুর্বল করেছে। যুগপৎ আন্দোলনকে রাজনৈতিক এবং নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ইসলামী দলগুলোর মধ্যে মূলতঃ জামায়াতে ইসলামীই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি এবং মাঠ পর্যায়ের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে জনগণের মধ্যে জামায়াত ব্যাপক ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি। আরো সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপাদানও জামায়াতের কম ছিল। এতদসত্ত্বেও প্রধান দু'জোটের পাশাপাশি যুগপৎভাবে জামায়াত এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছে তা বাংলাদেশের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে ভাস্বর হয়ে থাকবে। জামায়াত ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দলের ভূমিকা স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যান্য দলের সাংগঠনিক বিস্তৃতি এবং নেতৃত্বের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার অভাবেই মূলতঃ তারা কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

ইসলামী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জনগণের ব্যাপক সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামপ্রিয় রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে কোন সময় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। জনগণের ব্যাপক সমর্থন পাওয়ার জন্য ইসলামী দলগুলোকে আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্ব সহকারে বাস্তব এবং কার্যকর কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দকোষ

আ'মল - কার্যক্রম/কার্যাবলী

আমীর- পরিচালক/ সভাপতি

আমীরে শরীয়ত - বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রধান পরিচালক

কেয়ার-টেকার সরকার - তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গায়রুল্লাহ - আল্লাহর একত্ববাদ পরিপন্থী

জাহান - বিশ্ব

জেহাদ - ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

তরীকা - পদ্ধতি / ব্যবস্থা

দ্বীন - ইসলামী জীবন বিধান

নায়েবে আমীর- সহকারী পরিচালক বা নেতা

ফেকাহ - কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে মুসলিম পণ্ডিতগণের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত

মজলিশে শূরা - পরামর্শ পরিষদ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা

রুকন - সদস্য

শরীয়াহ্ - শরীয়ত / ধর্মীয় আইন

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক. দলীয় প্রকাশনা - জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ , ১৯৯৫

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী, প্রচারবিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৪

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৮

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৪

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩

ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩

প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৭৯

বুলেটিন (ইংরেজী) জামায়াতে ইসলামী, প্রচার বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৪

সামরিক সরকার ও রাজনেতিক সংলাপ , জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র, ১৯৮৩

<u>বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ঃ</u>

গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

গোলটেবিল বৈঠকে হাফেজ্জী হুজুরের ভাষণ

গৃহবন্দীর পর খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ কর্তৃক প্রচারিত লীফলিট্

সত্যের কষ্টি পাথরে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনঃ

নীতিমালা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

পরিচিতি - ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

মাওলানা ফজলুল করিমের (পীর সাহেব চরমোনাই) সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

জাতীয় সম্মেলন '৯৯ স্মারক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

ছাত্র সংবাদ

রক্তাক্ত জনপদ

খ. সরকারি প্রকাশনা ঃ

Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission Report; Jatiya Sangsad Election, 1986, May 7, 1986

গ. সংবাদপত্র ঃ

দৈনিক আজাদ

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক খবর

দৈনিক দেশ

দৈনিক বাংলার বাণী

দৈনিক সংগ্রাম

দৈনিক সংবাদ

The Bangladesh Observer

ঘ. সাময়িকী ঃ

সাপ্তাহিক রোববার

পাক্ষিক পালাবদল

নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট

Asia Week

Asian Survey

Bangladesh Political Studies , Chittagong Univesity

Far Eastern Economic Review

The Journal of Political Science Association 1993

ঙ) প্রবন্ধ

Ataur Rahman, "Democracy & Governance in Bangladesh". বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৯৩

Bhuiyan Monoar Kabir " Collapse of the Top-down legitimisation Strategy and the dilemmas of Bottom- up transition Bangladesh –1986-88" Bangladesh political Studies Vol. xvi, 1994

Hossain Mohammed Ershad " Role of the Military in Bangladesh." Holiday, December 6, 1981.

Iftekharuzzaman & Mahbubur Rahman "Transition & Democracy in Bangladesh : Issues and outlook" paper presented at the seminar on Transition & Democracy in Bangladesh" organised by BIISS in Dhaka.

Kazi Shahdat Kabir "Islam and Politics in Bangladesh (1971-90) (unpublished)

Mahabubur Rahman "Elite formation in Bangladesh Politics" in BIISS Journal Dhaka
1989 Vol 10 No-4

Muhammad A. Hakim, The fall of Ershad Regime & its aftermath" Regional Studies , Vol No-1

Munir Ahmed Chowdhury, "Induction of State Religion in the constitution of Bangladesh" in Bangladesh Political studies Vol-ix-xiii

Rafiqul Islam Chowdhury, Recruitment of Political Elite and Political Development in India & Nigeria, Ph.D, Dissertation

Samina Ahmed, "Politics in Bangladesh : The Paradox of Military Intervention" Regional Studies 9;1 (Winter 1990 – 91)

Syed Sirajul Islam, "Bangladesh in 1986: Entering a new phase", Asian Survey, 27.2, February 1987

Tajul Islam Hashmi, " Islam in Bangladesh Politics" in Hussain Mutalib & Tajul Islam Hashmi, Islam, Muslims and the modern states: case studies of Muslims in thirteen countries' in Martin's press, Newyork.

J.L Esposito, "Introduction : Islam & Muslim Politics" in T.L. Esposito, Voices of Resurgent Islam (Oxford University Press 1983)

U-A-B Razia Akter Banu, " Jammat-E-Islami in Bangladesh :
Challenges & Prospects" in Hussain Mutalib & Tajul Islam Hashmi ' Islam Muslims and the modern states : case studies of Muslims in thirteen countries, st' martin's press, Newyork.

ড: গোলাম হোসেন "বাংলাদেশে বিকাশমান গনতন্ত্র: তত্ত্ব ও প্রয়োগ" বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৯৩

ড: মোহাম্মদ সোলায়মান "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট - এরশাদের শাসনকাঠামো", রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৯৩

মাহফুজ পারভেজ, "রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার বর্ণনা" বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ, খণ্ড-৬-১০, ১৯৯৪

সালাউদ্দিন বাবর, "বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর" নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট জানু-'৯৭

পুস্তক /পুস্তিকা

আযম, গোলাম, পলাশী থেকে বাংলাদেশ, ১৯৯১

আযম, গোলাম, জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

আজাদ, আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা, বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২২ দফা থেকে ৫ দফা, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭

আওদাহ, শহীদ আবদুল কাদের, দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, অনুবাদ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, IIFSO, 1978

আহমদ, কাজী সগীর, আপসহীন জননেতা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, প্রত্যয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

আসাদ, আবুল, বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম

ইসলাম, মেজর রফিকুল, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১

কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ, বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন, ১৯৯৩

খান, আব্বাস আলী, একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৮

খান আব্বাস আলী, কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন, ১৯৮৬ উদ্বোধনী ভাষণ (পুস্তিকা)

নিজামী, মাওলানা মতিউর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, ১৯৯৮.

ফারুক, আখতার, খেলাফত আন্দোলন কি ও কেন? আশরাফ প্রকাশনী, ঢাকা। ?

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা - জামায়াতে ইসলামী উনত্রিশ বছর, ১৯৯২, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

মোহাম্মদ, ড: হাসান, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ; নেতৃত্ব, সংগঠন, ও আদর্শ, একাডেমী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩

রহমান, অধ্যাপক মুজিবুর, জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী, আল ইসলাহ প্রকাশনী, রাজশাহী, ১৯৮৯

সামাদ, ডক্টর এবনে গোলাম, বাংলাদেশ ইসলাম, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭

সালেহীন, ফাইজুস, বাম রাজনীতির ৬২ বছর, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১

Moten, Abdul Rashid, Political Dynamics of Islamization in Bangladesh. ?

Ahmed, Borhanuddin, The Generals of Pakistan and Bangladesh (New Delhi Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1993)

Azam, Professor Golam, A guide to the Islamic Movement (Dhaka, Azam Publication, 1968)

Bosworth, C.E. and Jaseph Schachat, The Legacy of Islam, Oxford (Oxford University Press, 1989)

G Ferguson, Coup- D`etat : A Practical Manual, Dorset, Arms and Armour Press Ltd 1987

Hakim, Muhammad A, The Shahabuddin Interregnum, University Press Ltd, Dhaka-1993

Sarwar, Gholam, Islam, Belief & Teachings, The Muslim Education Trust, London.